নবগ্রহ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আষাঢ়—১৩৩০

প্রকাশক —
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স

২০৩।১।১
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার — শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিক

পূজনীয়া ভ্রাতৃজায়া

শ্রীমতী শৈবলিনী দেবীর

—করকমলে—

এই বহিখানিতে নয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে, সেইজন্য নাম "নবগ্রহ"; তদ্ভিন্ন অন্য কোনও সঙ্গতি নাই।

গল্পগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, নারায়ণ ও যমুনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই বহির মুদ্রাঙ্কন ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত ও উপদেশের জন্য আমি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যতিনাথ ঘোষের নিকট ঋণী।

ভাগলপুর
২রা আষাঢ়, ১৩৩০। } শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সূচী

প্রতিক্রিয়া … … ১
অর্থমনর্থম্ … … ২৮
প্রমাণ … … ৫৩
লক্ষ্মীলাভ … … ৭৩
ক্রয়-বিক্রয় … … ৮১
জীবন-নাট্য … … ৯১
কলি ও কুসুম … … ১০৮
কিস্তিমাত্ … … ১৩৭
দ্বিতীয় পক্ষ … … ১৫২

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

শশিনাথ	২॥০
সপ্তক	॥৵০

নবগ্রহ

প্রতিক্রিয়া

১

শ্বশুর দরিদ্র এবং পিতা ধনবান্ হইলে এবং তৎ-সহিত স্বামীর ডেপুটিত্ব যোগ দিলে অনেক স্থলে যাহা ঘটে, সুকুমারীর তাহাই হইয়াছিল; অর্থাৎ ধনশালীর কন্যা এবং হাকিমের স্ত্রীরূপে তিনি মাত্র শ্বশুরকে একটু কৃপাচক্ষে দেখিতেন; কিন্তু শ্বশুরের ভার্য্যা এবং কন্যাগণকে তিনি সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করিয়া চলিতে শিখিয়াছিলেন। শাশুড়ী ও ননদদিগের তুলনায় সুকুমারী আপনাকে এতই অধিক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত মনে করিতেন যে, তিনি তাহাদের সহিত কলহ করিয়াও কখন নিজেকে খর্ব্ব করিতেন না। শুধু নিজের শক্তি এবং ক্ষমতাকে এমন ধীর এবং অপ্রতিহতভাবে পরিচালনা করিয়া যাইতেন যে, কলহের অবিদ্যমানেও সংসারে একটা শব্দহীন অশান্তি সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিত! স্তব্ধ মৌনতার মধ্যে ভীষণতা যত সহজে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, কলহের মধ্যে তত নহে।

শান্ত এবং কলহ-অপটু বলিয়া শাশুড়ী যোগমায়ার বিশেষ খ্যাতি ছিল না; কিন্তু কথা না কহিয়া, যে শুধু কাজ করিয়া যায়, তাহার ধীশক্তি অপরিমেয়, তাহাকে আঁটিয়া উঠা কঠিন। সেই জন্য কলহ

করিয়াও এবং কলহ না করিয়াও, বধূর নিকট যোগমায়াকে সর্ব্বপ্রকারে হার মানিতে হইত। যোগমায়া রাগ করিতেন, ঝগড়া করিতেন, কান্নাকাটি করিতেন, অনাহারে থাকিতেন। কিন্তু অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব তাঁহারই দিক্ হইতে আসিত। সুকুমারী নিয়মিত আহার, নিদ্রা এবং সুনিবিড় নীরবতার মধ্য দিয়া অতি সহজে জয়লাভ করিত।

শ্বশুর কালীচরণ কিন্তু বাস্তবিকই নিরীহ লোক ছিলেন। তিনি পুত্রবধূর কবল হইতে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, শাশুড়ীবধূর বিবাদের মধ্যে একপদ অগ্রসর হইতেন না। সুকুমারীর পিতৃগৃহের অর্থে কালীচরণের সংসার চলিত না, সুকুমারীর স্বামী অজয়নাথের পক্ষ হইতে কালীচরণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যাইত না।—এমন কি কালীচরণ যে কয়েকটি টাকা পেন্সন পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার এবং তাঁহার পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিত—তথাপি তিনি সুকুমারীকে ভয় করিয়া চলিতেন। কেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন;—সম্ভবতঃ কালীচরণ সুকুমারীকে ভয় করিতেন না—অশান্তিকেই ভয় করিতেন; কিন্তু সুকুমারী নিজের মনে বুঝিয়াছিল যে, সে ধনীর কন্যা এবং ডেপুটির গৃহিণী বলিয়া সকলে তাহাকে ভয় করে।

কালীচরণের এই ভীরুতা এবং আত্মসম্মানের অভাব দেখিয়া যোগমায়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া যাইতেন; কিন্তু উপায়ও কিছু ছিল না। কালীচরণ স্থির বুঝিয়াছিলেন যে, পত্নী ও পুত্রবধূর বিবাদে মধ্যস্থতা করিয়া অশান্তি-লাঘবের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; বরং 'যঃ পলায়তে' করিলে নিজের পক্ষে কতকটা সুবিধার সম্ভাবনা। তাই, অন্তঃপুরে যখন যোগমায়া উন্মত্তের মত আস্ফালন করিতে থাকিতেন এবং সুকুমারী স্তব্ধভাবে রক্তমূর্ত্তি হইয়া গৃহকার্য্য করিয়া বেড়াইত, তখন হয় ত দেখা

যাইত, বাহির্বাটীতে বৈঠকখানায় তক্তাপোষের উপর পরম নিশ্চিন্তমনে হাতে পায়ে ভর দিয়া কালীচরণ ঘোড়া হইয়াছেন এবং পৌত্র গোপালচন্দ্র পৃষ্ঠের উপর আরূঢ় হইয়া পিতামহের মুখে পৈতা জড়াইয়া নৃত্য করিতেছে।

অন্দরের মধ্যে শান্তিতে সময় কাটাইবার তেমন সুবিধা ছিল না বলিয়া, বহির্বাটীর নির্জ্জনতার মধ্যে এই পৌত্র-পিতামহ পরস্পরের ভিতর একটা তীব্র আকর্ষণ ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিয়াছিল। সকল পিতামহই ত পৌত্রকে ভালবাসিয়া থাকে; কিন্তু কালীচরণের কথা একটু স্বতন্ত্র ছিল। যে স্নেহামৃতের একটি বিন্দু গৃহাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিবার সুবিধা ছিল না, গোপালের জন্য তাহার প্রতিবিন্দু বর্ষিত হইবার অপেক্ষায় প্রস্তুত হইয়া থাকিত। গোপালকে লইয়া কালীচরণ পত্নী ও পুত্রবধূকে ভুলিয়াছিলেন। অন্দরের সংবাদ অন্দরেই নিবদ্ধ থাকিত। বহির্বাটীতে কালীচরণ সমস্ত দিন গোপালকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। বড়লোকের দুহিতা ডেপুটিগৃহিণী মনে করিতেন, দরিদ্র শ্বশুর তাঁহার পুত্রকে লালন করিবার ভার লইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন; এমন কি যোগমায়াকেও সময়ে সময়ে সেইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে দেখা যাইত; কিন্তু প্রকৃত সংবাদ অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না।

গোপালের দৌরাত্ম্যে কালীচরণের একদণ্ড স্থির থাকিবার যো ছিল না। প্রভাতে উঠিয়া কালীচরণ হিসাবের বহি লইয়া বসিয়াছেন; দোয়াত হইতে কালী লইতে গিয়া দেখেন, যথাস্থান হইতে দোয়াত কখন্ অন্তর্হিত হইয়াছে এবং গোপাল নিবিষ্টচিত্তে শুভ্র চাদরের উপর দিব্যরূপে মসীলেপন করিতেছে। স্নানের সময় ভৃত্য জল ও তৈল দিয়া গিয়াছে— স্নান করিতে বসিয়া কালীচরণ দেখেন, গোপাল তেলের বাটী বাল্‌তির ভিতর অবলীলাক্রমে ডুবাইয়া দিয়াছে। সমস্ত তৈল জলের উপর

ভাসিতেছে। কালীচরণ নস্য লইতেন—নস্যের কৌটা পার্শ্বে রাখিয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখেন, কৌটা খুলিয়া গোপাল সমস্ত নস্য তাঁহার নাসিকার উপর নিক্ষেপ করিয়াছে। কালীচরণ তখন হাঁচিতে হাঁচিতে হাসিতে থাকিতেন। প্রতিদিন গোপাল এইরূপ নানাপ্রকার উপদ্রবের সৃষ্টি করিত। তদ্ভিন্ন কাক ডাকা, বক ডাকা, ঘোড়া হওয়া, কলের গাড়ী হইয়া মুখে বাঁশী বাজাইয়া দুই হস্ত সঞ্চালিত করা—এ সকল ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় করিতে হইত। কিন্তু কালীচরণের এ সকলে কিছুমাত্র বিরক্তি ছিল না, বরং যে দিন উপদ্রবের সংখ্যা কম হইত, সেদিন তাঁহার একটু ফাঁকা ফাঁকা মনে হইত।

২

অন্তঃপুরে দুইদিন হইতে যোগমায়ার সহিত সুকুমারীর সংঘর্ষণজনিত অগ্ন্যুৎপাদন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ভোলা চাকরকে সংসার হইতে তাড়াইবার জন্য যোগমায়া বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলেন—সে শুধু অকর্ম্মণ্য এবং অলস নহে—যোগমায়ার সহিত তাহার আচরণ নিতান্ত আপত্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল। ভোলার ব্যবহার এবং আচরণের দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত যে, তাহার মতে সংসারের যথার্থ গৃহিণী যোগমায়া নহেন, সুকুমারী। সর্ব্বাপেক্ষা ক্রোধের কারণ হইয়াছিল, কয়েকদিন হইতে ভোলা সুকুমারীকে 'মা' এবং 'ঠাকমা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 'ঠাক্‌মা' এবং 'মা'র মধ্যে যে নিগূঢ় অর্থ নিহিত ছিল, যোগমায়া তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। উঠিতে বসিতে তিনি ভোলাকে নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সুকুমারী কিন্তু ঠিক বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছিল। সে ভোলার প্রতি অযথা স্নেহশীলা হইয়া উঠিয়াছিল। ভোলার মাতৃ-

সম্বোধনের প্রতি একমুহূর্ত্তও তাহাকে অসম্মান করিতে দেখা যায় নাই। যোগমায়া যখন রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া ভোলাকে তিরস্কার করিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই হয় ত সুকুমারীর মাতৃহৃদয়ে স্নেহের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; একটা পাত্রে জলখাবার আনিয়া ভোলাকে বলিল, "সমস্ত দিন ত খেটে মর্‌ছিস্, যা, আগে একটু খাবার খেয়ে মুখে জল দে!" ভোলা খাবারের পাত্র লইয়া যোগমায়ার প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল যোগমায়া হয় ত ভোলাকে একটা কঠিন এবং কষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন; সুকুমারী আসিয়া বলিল, "ভোলা, যা, খুকি ঘুমুচ্ছে, তার কাছে একটু বসে থাক্।" ভোলা যোগমায়ার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য চলিয়া গেল।

অবশেষে একদিন ভীষণভাবে দীর্ঘকালব্যাপী ঝগড়া করিয়া যোগমায়া ভোলাকে ছাড়াইয়া দিলেন। ভোলা তাহার মাহিনা কড়াক্রান্তি বুঝিয়া লইয়া সুকুমারীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে যোগমায়া ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন, সুকুমারীর কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া ভোলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

"তুই যে আবার এসেছিস?"

একটু বিদ্রূপের সহিত ভোলা বলিল, "আমি কি আপনি এসেছি—মা ডাকিয়েছেন তবে এসেছি।"

যোগমায়া ক্রোধে তপ্ত হইয়া উঠিলেন,—"এখনই দূর হ' হারামজাদা!"

চক্ষু গোল করিয়া ভোলা বলিল,—"গাল কেন দাও গা? আমি কি তোমার চাকর যে তোমার কথায় দূর হ'ব? মা আমাকে বলেছেন, তাঁর বাপের বাড়ীর পয়সায় তিনি আমার মাইনে দেবেন। আমাকে গাল মন্দ দিও না বল্‌ছি!"

অপমানে ও ক্রোধে যোগমায়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন। তুমি! চাকর হইয়া তাঁহাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিবে—আর সুকুমারী হইলেন তিনি!

"বউমা!"—গৃহ যোগমায়ার কণ্ঠশব্দে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

সহজ ভঙ্গীভরে সুকুমারী আসিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি ভোলাকে কার হুকুমে বাড়ীতে ঢুকিয়েছ?"

সুকুমারী ধীরভাবে বলিল, "ভোলাকে ছাড়ালে আমার চল্‌বে না, মা! ও মাইনে আপনাদের দিতে হবে না; আমার বাবা দেবেন।"

অপমানে যোগমায়ার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, "এতদূর তোমার আস্পর্দ্ধা হয়েছে! আচ্ছা, আজ ওঁকে ব'লে যা হয় একটা কর্‌ব। হয় তুমি এ বাড়ী থেকে বেরবে, নয় আমি বার হ'ব।" কাঁদিতে কাঁদিতে যোগমায়া ঘরে প্রবেশ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। বাহিরে ভোলা খুকিকে ভুলাইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "খুকুন যাবে শ্বশুরবাড়ী, সঙ্গে যাবে কে—বাড়ীতে আছে কেলো কুকুর, কোমর বেঁধেছে।"

দ্বিপ্রহরে কালীচরণ আহার সমাপন করিয়া আচমন করিতে যাইবেন, এমন সময় কাঁদিতে কাঁদিতে যোগমায়া আসিয়া পথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া যোগমায়ার মুখ ফুলিয়া গিয়াছিল—এবং ক্রোধে ও অপমানে সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল।

যোগমায়া বলিলেন,—"তুমি কোন দিন আমার কোন কথা শোন নি। আজ যদি আমার কথায় কাণ না দাও ত আজ আমি বিষ খেয়ে মর্‌ব। কাল ভোলাকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম—তোমার গুণবতী বউ তাকে ডাকিয়ে আমাকে অপমান কর্‌বার জন্য বাহাল করেছেন। আমাকে বল্লেন, তাঁর বাপের পয়সায় ভোলার মাইনে দেবেন। ভোলা

আমাকে চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে যে, আমি যেন তার সঙ্গে কথা না কই—সে আমার চাকর নয়। তোমার গুণের বউ নিয়ে তুমি ঘর কর, আমাকে ছুটী দাও। আমি আজ বিষ খেয়ে মর্‌ব!” উচ্চৈঃস্বরে যোগমায়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এতদিন যে উপদ্রব দূর হইতে নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, যোগমায়ার কথা শুনিয়া ও অবস্থা দেখিয়া আজ সহসা কালীচরণের নিকট তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। যোগমায়ার সমগ্র অপমান তাঁহারই মস্তকে যেন কুঠারাঘাত করিতে লাগিল।

চীৎকার করিয়া কালীচরণ ডাকিলেন, “ভোলা!”

ভোলা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—“আজ্ঞে?”

অধৌত হস্তে পা হইতে চটীজুতা খুলিয়া কালীচরণ সজোরে ভোলাকে ছুড়িয়া মারিলেন।

“পাজি! শয়তান! বের আমার বাড়ী থেকে—এখনই বের!” ক্রোধে কালীচরণ কাঁপিতে লাগিলেন।

নেপথ্যে দাঁড়াইয়া সুকুমারী সব শুনিতেছেন। তীব্র অপমানের আঘাতে কঠিন এবং রক্তিম হইয়া সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভোলা আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “মা ঠাক্‌রুণ আমাকে ছেড়ে দিন, জুতা খেয়ে আমি এ বাড়ীতে থাক্‌তে পার্‌ব না!”

সুকুমারীর চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিকগোলকের মত প্রদীপ্ত এবং নাসিকা স্ফীত হইয়া উঠিল।

“ও জুতা তুই খাস্‌ নি ভোলা—ও জুতা আমাকেই মারা হয়েছে! তোকে এখানে থাক্‌তে হবে না—যা একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়, জলস্পর্শ না ক’রে এখনই আমি বাপের বাড়ী চলে যাব!”

৩

অপরাহ্ণে বহির্বাটীতে গোপালের সহিত কালীচরণের শারীরতত্ত্বের আলোচনা চলিতেছিল।

গোপাল জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "দাদাবাবু, মেয়ে মানুষের গোঁপ্ ওঠে না কেন ?"

এই গুরুতর প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া কালীচরণ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, এমন সময় পরিচারিকা বিন্দি আসিয়া বলিল, "গোপাল, তোমার মা ডাক্‌চেন, এস, গাড়ী এসেছে, মামার বাড়ী যাবে।"

গোপাল সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, বিন্দির গোঁপ্ ওঠে নি কেন ?"

প্রশ্ন শুনিয়া বিন্দুবাসিনী, ওরফে বিন্দি, ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কালীচরণ কোন কথা কহিলেন না—ব্যাপারটা তিনি কতকটা অনুমান করিয়া লইয়া মনে মনে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

"কেন রে বিন্দি, বৌমা হঠাৎ বাপের বাড়ী যাচ্ছেন ?"

বিন্দু মৃদুস্বরে বলিল, "কি জানি বাবু, বউদিদি আজ ভাত খান নি—সমস্ত জিনিষপত্র গুছান হ'য়ে গিয়েছে, গাড়ী এসেছে। এখনই বাপের বাড়ী যাবেন।"

গোপালকে লইয়া চিন্তিতমনে কালীচরণ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই সুকুমারী দাঁড়াইয়া গোপালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কালীচরণ নিকটে গিয়া বলিলেন, "বউমা, তুমি এখনও ভাত খাও নি ?"

সুকুমারী কালীচরণের সহিত কথা কহিত, কিন্তু আজ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। উত্তর দিল না।

কালীচরণ স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "না খেয়ে বাপের বাড়ী যাচ্ছ, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ মা! আমি ত তোমাকে কিছু বলি নি!"

সুকুমারী গোপালকে টানিয়া লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। কালীচরণও কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বউমা, গুরুজনের মনে কষ্ট দিতে নেই। ভাত খাওগে যাও, আর তোমার যদি নিতান্ত যাবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, দু'দিন না হয় বাপের বাড়ী বেড়িয়ে এস। গোপালকে নিয়ে যেও না। তুমি ত জান গোপালকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারি না!"

গোপালকে রাখিয়া যাইবার মত সুকুমারীর কিন্তু কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সে গোপালকে পরিচ্ছদ পরাইতে আরম্ভ করিল। কালীচরণ বুঝিলেন, তাঁহার আর্‌জি সহজে মঞ্জুর হইবার সম্ভাবনা নাই; বলিলেন, "বউমা, আমাকে ক্ষমা কর! তুমি ভোলাকে না হয় রে'খ, আমি কিছু বল্‌ব না—" কালীচরণের কণ্ঠ কাঁপিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল।

সুকুমারীর কঠিন হৃদয় বিচলিত হইবার নহে। গোপালকে লইয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। মামার বাড়ী যাইবে বলিয়া গোপাল প্রথমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া যখন বুঝিতে পারিল কালীচরণ যাইবেন না, তখন সে বাঁকিয়া বসিল।

"দাদাবাবু, তুমিও এস, দাদাবাবু, তুমিও এস!" অবশেষে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িবার জন্য গোপাল অধীরভাবে কাঁদিতে লাগিল। "দাদাবাবু, আমি মামার বাড়ী যাব না, তোমার কাছে থাক্‌ব!" সুকুমারী নির্দ্দয়ভাবে গোপালকে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।

কালীচরণের চক্ষে অশ্রু গাঢ় হইয়া নামিয়া আসিল। গোপালের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "ছি দাদা, কাঁদ্‌তে নেই, হাস্‌তে হাস্‌তে মামার বাড়ী যাও!"

গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ ছাপাইয়া গোপালের কাতরোক্তি শুনা যাইতে লাগিল। কালীচরণ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন গোপাল বলিতেছে, "আমি যাব না, আমি দাদাবাবুর কাছে থাক্‌ব, আমাকে ছেড়ে দাও!" কালীচরণের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যেন কে নির্ম্মমভাবে শূল বিদ্ধ করিতে লাগিল।

গলির বাঁক ফিরিয়া গাড়ী যখন দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল, তখনও যেন গোপালের ক্রন্দন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কালীচরণের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। কালীচরণের মনে হইতে লাগিল, কলিকাতা সহরের সহস্র প্রকার কোলাহলের একত্র মিলিত উদারা সুরের গভীরতার মধ্যে যেন পাঁচ বৎসরের একটি শিশুকণ্ঠের ক্ষীণ তীক্ষ্ণ সুর, অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও পরিষ্কার স্বতন্ত্রভাবে শুনা যাইতেছে। গাড়ীর শব্দ আর শুনা যায় না। সে গাড়ীর পর আরও পাঁচ সাত খানা গাড়ী সশব্দে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কালীচরণের কর্ণে যেন লাগিয়া রহিয়াছে, "আমি দাদাবাবুর কাছে থাক্‌ব, আমাকে ছেড়ে দাও!" একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কালীচরণ তাঁহার শূন্য বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। আলবোলার নল মুখে দিয়া কালীচরণের চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল! তখনও কর্ণে বাজিতেছিল, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও!"

৪

কোন উপদ্রব নাই, কোন উৎপীড়ন নাই! দোয়াতের কালী দোয়াতেই থাকে, নস্যের কৌটা হইতে নস্য নাসিকার উপর ঢালিয়া দেয় না, মাখিবার তৈল পাত্রের মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে অপেক্ষা করে,—নিদ্রার ব্যাঘাত নাই, অবসরের অভাব নাই; কিন্তু তথাপি কালীচরণ

অশান্তির তাড়নায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। স্নান করিতে গিয়া চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসে! আহার করিতে বসিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া আহার অসমাপ্ত রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে উঠিয়া পড়েন! দিনের মধ্যে সর্ব্বদা তাঁহার মনে হয় কে যেন তাঁহাকে ডাকিল, "দাদাবাবু!" চকিত হইয়া কালীচরণ চাহিয়া দেখেন। কিন্তু বৃথা! কেহ কোথাও নাই! শুধু উদাস বায়ু জানালার ছিদ্রের মধ্য দিয়া করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে।

পাঁচ দিন গোপাল গিয়াছে। প্রথম দিনটা কালীচরণের কতকটা নেশার মত কাটিয়াছিল,—একটা তীব্র মর্ম্মস্পর্শী অভিমানের নেশা তাঁহার সমস্ত অনুভূতি ও ক্লেশকে কতকটা বিবশ করিয়া রাখিয়াছিল। দুঃখে যে হৃদয় মথিত হইতেছিল না, তাহা নহে; কিন্তু দুঃখের ঠিক বিপরীত দিকে একটা প্রবল অভিমান টান দিতেছিল। এই পাঁচ দিনে সেই অভিমানের টান ক্রমান্বয়ে শ্লথ হইয়া প্রায় শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে—এখন দুঃখটাই সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

সমস্ত দিন ইতস্ততঃ করিয়া বৈকালে কালীচরণ কোন প্রকারে আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে পারিলেন না। দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর, একটা অজ্ঞেয় শক্তি অপরাহতভাবে তাঁহার দেহ ও মনকে আকর্ষণ করিতেছিল। যষ্টি লইয়া কালীচরণ পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। অন্তরের পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলির সহিত তখনও স্পষ্টরূপে বুঝা পড়া হইয়া উঠে নাই; তথাপি যেন মন্ত্রশক্তি বলে কালীচরণ গোপালের মামার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় ব্যাকুল উচ্ছ্বসিত ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল, "দাদাবাবু!"

কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া গোপাল কালীচরণকে জড়াইয়া

ধরিল। কালীচরণ গোপালকে বক্ষের উপর তুলিয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর অদর্শনক্লিষ্ট দুইটি বন্ধুর মধ্যে আগ্রহভরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

গোপাল বলিল, "দাদাবাবু, আমার সঙ্গে তুমি এলেনা কেন? তুমি বড় দুষ্টু!"

কালীচরণ গোপালকে বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, আমি দুষ্টু, তুমি খুব লক্ষ্মী!"

গোপাল কালীচরণকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "আচ্ছা তুমিও লক্ষ্মী, বল আর চ'লে যাবে না!"

এমন স্নেহের যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি বা ছলনা করিতে কালীচরণের কষ্ট হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "তুমি চলনা ভাই আমার সঙ্গে?"

ব্যস্ত হইয়া গোপাল কালীচরণের ক্রোড় হইতে নামিয়া পড়িল। উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "আচ্ছা, কাপড় প'রে আসি।" পরক্ষণেই সহসা তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। মা মার্‌বে। দাদাবাবু, তোমার কাছে যাব বল্লে মা আমাকে মারে।"

কালীচরণের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। "তবে সে কথা আর ব'লোনা ভাই!"

"দাদাবাবু, ভোলা বড় দুষ্টু; না?"

"বড্ড!"

"আমি বড় হ'লে ভোলাকে খুব মার্‌ব!"

কালীচরণের বৈবাহিক সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। দাসদাসী, কর্ম্মচারী, আত্মীয়স্বজন যাহারা ছিল, তাহাদের দ্বারা কলিকাতার ধনী বৈবাহিকের গৃহে দরিদ্র বৈবাহিকের সাধারণতঃ যেরূপ সমাদর হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছিল—অর্থাৎ কেবলমাত্র শুষ্ক মৌখিক—'কেমন

আছেন ?' 'ভাল আছেন ?' 'নমস্কার !'—ছাড়া তুচ্ছ পান তামাক পর্য্যন্তও আসিতেছিল না। কালীচরণের সে সকল দিকে দৃষ্টি ছিল না, তিনি গোপালকে লইয়া তন্ময় হইয়াছিলেন। বিস্তৃত সাগরের মধ্যে অবস্থান করিয়া, নদী হইতে জল অধিক আসিতেছে কি অল্প আসিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার তাঁহার অবসর ছিল না।

গোপাল বলিতেছিল, "দাদাবাবু, এখানকার দাদাবাবু ভাল না, কই ঘোড়া হয় না ত ?"

কালীচরণ বলিলেন, "এখানকার দাদাবাবু গাধা কিনা, তাই ঘোড়া হয় না !"

"দাদাবাবু, একবার ইঞ্জিন হও না ?"

বৈবাহিকের গৃহে বসিয়া, অপরিচিত লোকের সম্মুখে, কি করিয়া হস্ত সঞ্চালিত করিয়া মুখে বাঁশী বাজাইবেন তাহাই কালীচরণ ভাবিতেছিলেন, এমন সময় একজন পরিচারিকা উপস্থিত হইয়া বলিল, "খোকা এস, দুধ খাবে এস।"

গোপাল তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "যাও, আমি দুধ খাব না।"

পরিচারিকা বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি দস্যি ছেলে গো ! চল শিগ্‌গির, নইলে তোমার মা মার্‌বেন। ওই দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।"

কালীচরণ স্নেহভরে বলিলেন, "যাও দাদা, দুধ খেয়ে এস, ছিঃ দুষ্টুমি কর্‌তে নেই !"

গোপাল যখন দেখিল দুধ খাওয়া ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই, তখন বলিল, "দুধ খেয়েই আমি আস্‌ব, তুমি যেয়োনা, দাদাবাবু"—বলিয়া কালীচরণকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে গোপাল পরিচারিকার সহিত চলিয়া গেল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল নীরবে বসিয়া থাকার পর কালীচরণ শুনিতে পাইলেন, দ্বিতলের কক্ষে গোপাল উচ্চস্বরে কাঁদিয়া বলিতেছে, "না, দাদাবাবু চ'লে যায় নি, আমি দাদাবাবুর কাছে যাব!"

কালীচরণ অধীর হইয়া উঠিলেন! কে বলিল তিনি চলিয়া গিয়াছেন! তিনি ত গোপালের অপেক্ষায় জড়ের মত একস্থানে বসিয়া রহিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা একটি রেকাবে দুইটি সন্দেশ এবং দুইটি রসগোল্লা লইয়া উপস্থিত হইল। দুই খিলি পানও রেকাবের উপর রক্ষিত ছিল। বিদায়-সম্ভাষণের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তাহারা যেন বলিতেছিল, "নমস্কার! তা হ'লে চর্ব্বণ কর্‌তে কর্‌তে বেরিয়ে পড়ুন।"

জলের পাত্র রেকাবের নিকট রাখিয়া দাসী বলিল, "বাবু, একটু জল খান।"

কালীচরণ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "ঝি, গোপাল এল না?"

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কতকটা প্রবেশ লাভ করিয়া, ঝি মনে মনে সুকুমারীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল, "কি জানি বাবু, বল্‌তে পারিনে! সে নাকি এরি মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে; দিদিমণি বল্‌লেন, সে আর আস্‌তে পার্‌বে না। আপনি জল খান।" ঝি চলিয়া গেল।

তখনও গোপালের ক্রন্দন শুনা যাইতেছিল। কালীচরণ বজ্রাহতের মত নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। দুঃখে ও অপমানে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে যখন চাহিয়া দেখিলেন, দেখিলেন সদ্যধৌত পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া উচ্চ টেরি কাটিয়া স্কন্ধে শুভ্র তোয়ালে ঝুলাইয়া, হস্তে কারুকার্য্যখোদিত রৌপ্যনির্ম্মিত আলবোলার নল জড়াইয়া ফোলা গণ্ড স্ফীত করিয়া কলিকার আগুনে ফুঁ দিতেছে।

আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া যষ্টি হস্তে লইয়া কালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ভোলা বলিল, "খাবার খেলে না বাবু?"

কালীচরণের হস্ত নিমেষের জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কালীচরণ রাজপথে আসিয়া পড়িলেন।

ভোলা মিষ্টান্নের পাত্র লইয়া অন্তঃপুরে সুকুমারীর নিকট উপস্থিত হইল। অস্পৃষ্ট মিষ্টান্ন দেখিয়া সুকুমারী বলিল, "খাবার নিয়ে এলি যে?"

ভোলা বলিল, "কি কর্‌ব বল মা—আমি কত সাধলুম, কিন্তু বাবু বল্‌লে তোমার বাড়ীতে জলস্পর্শ কর্‌বে না, তোমার মুখদর্শনও কর্‌বে না।"

ভোলার কথা শুনিয়া সুকুমারীর মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। "বটে! তবে আমার হাতে যতটুকু আছে আমিও করে দেখি! এত স্পর্দ্ধা! আমার গৃহে আসিয়া আমাকে অপমান!"

পাত্রস্থ সন্দেশ রসগোল্লার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ভোলা বলিল, "মা, খাবার কোথায় রাখ্‌ব?"

ক্রুদ্ধস্বরে সুকুমারী বলিল, "ফেলে দিগে যা?"

দ্বিতীয়বাক্য না বলিয়া ভোলা প্রস্থান করিল। মিষ্টান্ন সে কোথায় নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা নির্ণয়ের জন্য অনুসন্ধানের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, অনুমানই যথেষ্ট!

৫

এবারকার অপমানের মাত্রাটা আরও গুরুতর হইয়াছিল। ফিরিবার পথে আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় কালীচরণের হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল। কেন তাঁহার এমন মূঢ়তা হইয়াছিল যে, গৃহ বাহিয়া অপমান সঞ্চয়ের জন্য গিয়াছিলেন! যেখানে ভালবাসার উপর কোনও দাবী নাই, সেখানে ভালবাসিতে যাওয়া ত দুর্ব্বলতার কথা! সে রকম ভালবাসা আপনার হৃদয়ের প্রতি গুরুতর অবিচার করা ভিন্ন ত আর কিছুই নহে! পার্শ্ব দিয়া বৈদ্যুতিক ট্রাম ঢং ঢং শব্দ করিয়া ছুটিয়া চলিতেছিল—ঘোড়ার গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ, পথচারী জনসাধারণের কল-কোলাহল—ক্রয়-বিক্রয় হাস্য-কৌতুক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মধ্য দিয়া কালীচরণ কলিকাতার পথের তরঙ্গহিল্লোল ঠেলিয়া গৃহাভিমুখে চলিতেছিলেন। পর্ব্বতপ্রমাণ অপমানের অন্তরালে গোপালের চিন্তা একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। শুধু মনে হইতেছিল, অপমানিত হইয়াছেন—উৎপীড়িত হইয়াছেন—বহিষ্কৃত হইয়াছেন। বৃষ্টিধারায় স্নিগ্ধ হইবার বাসনায় মেঘের তলায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—কিন্তু বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাতও যে হইতে পারে, সে কথা পূর্ব্বে মনে হয় নাই!

পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া কালীচরণের অন্তরে অগ্নি জ্বলিয়া জ্বলিয়া অবশেষে নিবিয়া গেল বটে, কিন্তু হৃদয়ের সরস জলীয় অংশটুকু প্রায় নিঃশেষিত করিয়া দিয়া গেল। যে কোমল উর্ব্বরা ভূমিতে আপনা-আপনি প্রতিনিয়ত পুষ্পলতিকা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিত, আঘাতের পর আঘাতে সে ভূমি ক্রমশঃ কঠিন হইয়া আসিয়াছে—কেবলমাত্র এখনও তাহাতে কণ্টকগুল্ম দেখা দেয় নাই—কিন্তু পুষ্পলতার সম্ভাবনা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে।

সে দিন সমস্ত দিন ধরিয়া ঘরে বসিয়া বসিয়া কালীচরণ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিনের জমাখরচের হিসাব পাঁচ মিনিটে শেষ হইয়া যায়। আহারের পর মধ্যাহ্নে নিদ্রার আরাধনা তপস্যার মত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে—ভুবন ঘোষের তাসের আড্ডায় যাইতে একেবারেই ইচ্ছা হয় না—সতরঞ্জ খেলিতে বসিলে পদে পদে চাল ভুল হয়—পাঁচ আনা সেরের তাম্রকূট পুড়াইয়াও সুগন্ধ পাওয়া যাইতেছে না—এবং সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটের হইয়া দাঁড়াইয়াছে আর একটা ব্যাপার! পার্শ্বের বাটীর হরনাথ মিত্র তাঁহার সদ্য-সমাগত পৌত্রকে লইয়া কালীচরণের গৃহে যখন তখন বেড়াইতে আসেন এবং সেই অস্থির পৌত্রটি সর্ব্বদাই "দাদাবাবু, দাদাবাবু" করিয়া এককালে হরনাথ ও কালীচরণকে অস্থির করিয়া তুলে। কালীচরণ ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হইয়া উঠেন—এবং যতই ভাবিতে চেষ্টা করেন যে, কিছুই কষ্ট হইতেছে না, ততই হৃদয়টা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করে। এ যেন জব্দ করিবার জন্য ভাগ্য-দেবতার কৌশল! নিজের পৌত্রকে ভুলিতে চাহেন বলিয়া পরের পৌত্র ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। কালীচরণ নানাপ্রকারে নিজের মনকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সে যেন তৃণ দিয়া অগ্নিকণাকে চাপা দেওয়ার মত সর্ব্বদাই একটা আশঙ্কা থাকে; হঠাৎ কোন মুহূর্ত্তে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া না উঠে।

হরনাথ মিত্র পৌত্রকে লইয়া বেড়াইতে আসিতেছেন দেখিয়া কালীচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন—হরনাথকে বলিলেন, "শরীরটা আজ ভাল বোধ হচ্ছে না, একটু বেড়িয়ে আস্‌ব মনে কচ্ছি।"

পথে বাহির হইয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ধরিয়া কালীচরণ বরাবর উত্তরমুখে চলিলেন। গৃহিণীকে সম্মত করিয়া কাশী যাইবার প্রস্তাব করিয়া অজয়নাথকে পত্র লিখিয়াছেন, কালীচরণ সেই কথা ভাবিতে-

ছিলেন। সে কি সুখের জীবন হইবে! একটি ক্ষুদ্র গৃহ লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে বসবাস করিবেন। প্রভাতে উঠিয়া পুণ্যমন্ত্রমুখরিত গঙ্গার তীরে অবগাহন; কোন দিন দশাশ্বমেধে, কোন দিন কেদারে, কোন দিন বা অসিতে। তাহার পর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পূজাপাঠ—দেবার্চ্চনা। অপরাহ্ণে গঙ্গার তীরে বসিয়া লীলাদর্শন, সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিয়া গৃহে ফেরা। এমনই করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে করিতে সহসা একদিন মণিকর্ণিকার অভিনয়ের দিন উপস্থিত হইবে। সে হয় ত কোন এক শরতের ঝলমলে প্রভাতে, কিংবা বরষার উদাস মধ্যাহ্নে, কিংবা শীতেরই স্তব্ধ নিশীথে কাশীর গঙ্গা পলকহীন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে দেখিতে চিত্রের মত শব্দহীন গতিহীন হইয়া আসিবে। মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ের মধ্যে কি একটা অব্যক্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যাইবে, তাহার পর প্রস্থান, মহাশূন্যের স্বচ্ছতা ভেদ করিয়া অসীমের পানে অকাতর ধাবন! সে মহাযাত্রার অন্ত কোথায় কিরূপে হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই; শুধু অখণ্ড আনন্দের মত সহজ গতিভরে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধের দিকে ছুটিয়া চলা।

"দাদাবাবু!"

পরিচিত প্রিয়কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া কালীচরণ চমকিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, হেহুয়ার ভিতরে রেলিং ধরিয়া গোপাল দাঁড়াইয়া। তাহার মুখে চক্ষে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

"দাদাবাবু ভেতরে এস!"

সংসার ত্যাগেচ্ছুর কণ্ঠদেশ প্রিয়জন বেষ্টিত করিয়া ধরিলে সে যেমন বিব্রত হইয়া উঠে, কালীচরণের অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইল। মণিকর্ণিকা-কল্পনার প্রভাব তখনও মনকে যথেষ্ট উদাস করিয়া রাখিয়াছিল এবং অশরীরী আত্মা মহানীলিমার রাজ্য হইতে তখনও

প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। কিয়ৎকাল স্তব্ধ রহিয়া কালীচরণ বলিলেন, "না দাদা, আমি বাড়ী যাই।"

গোপাল অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "না দাদাবাবু, তুমি এস, শিগ্‌গির এস। যেও না দাদাবাবু!"

পূর্ব্বদিনকার পরিচারিকা গোপালের নিকটেই ছিল। সে বলিল, "বাবু, একবার আসুন। গোপাল আপনার জন্য বড় হেদিয়েছে।"

কালীচরণের অন্তরের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু প্রবল, যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহাতে স্নেহই জয়লাভ করিল। কালীচরণ উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৬

শ্যামতৃণরাজির উপর উপবেশন করিলে গোপাল কালীচরণের গলা জড়াইয়া ধরিল। "দাদাবাবু, তুমি আমাদের বাড়ী থাক না কেন?"

কালীচরণ কহিলেন, "তুমি আমাদের বাড়ী থাক না কেন ভাই?"

গোপাল ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "কই, তুমি ত আমাকে নিয়ে যাও না।"

তাহার পর নানা প্রকার তর্কবিতর্ক, প্রশ্ন, উত্তর, আলোচনা প্রভৃতির পর এই দুইটি বৃদ্ধ ও শিশুর মধ্যে এমন একটা বোঝাপড়ার মত স্থির হইল যে, উপস্থিত অবস্থায় কাহারও বাটীতে কাহারও থাকার তেমন সুবিধা যখন ঘটিয়া উঠিতেছে না, তখন অন্ততঃ এই বাগানে প্রত্যহ বৈকালে কিছুক্ষণের জন্য একত্র অতিবাহিত করিতে পারিলে মন্দ হয় না।

পরিচারিকা পার্ব্বতীর পক্ষ হইতে এ বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া গেল, এবং স্থির হইল যে, পরামর্শের কথা তাহারা

তিনটি প্রাণী ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতে দেওয়া হইবে না ; সুকুমারী ও ভোলাকে ত কিছুতেই নহে। যতই সামান্য হউক না কেন, শিশুবুদ্ধিকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না। ভোলা ও সুকুমারী যে তাহার দাদাবাবুর ঠিক স্বপক্ষের লোক নহে, এ কথা গোপাল এই কয়েক দিনের মধ্যে একটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছিল, এবং বাগানে কালীচরণের সহিত দেখা সাক্ষাতের কথা সুকুমারী ও ভোলার নিকট সর্ব্বতোভাবে গোপন রাখা আবশ্যক, তাহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হইল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। আকাশে দুই একটি করিয়া তারা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল—এবং তাহাদের ক্ষীণ প্রতিবিম্ব হেদুয়ার স্বচ্ছ জলের উপর পড়িয়া মৃদু তরঙ্গাঘাতে কম্পিত হইতেছিল।

গোপাল বলিল, "দাদাবাবু, সব মানুষ মরে' তারা হয় ?"

কালীচরণ কহিলেন, "না ভাই, মন্দলোক মরে' তারা হয় না, যারা ভাল লোক তারাই তারা হয়।"

"ভোলা মরে' তারা হবে না, না দাদাবাবু ?"

মৃত্যুর পর ভোলা যে তারা হইয়া আকাশে প্রস্ফুটিত হইবে না, সে বিষয়ে কালীচরণের মতদ্বৈধ ছিল না। বলিলেন, "না।"

"তবে কি হবে ?"

"ভোলা মরে' চামচিকে হবে !"

পরজীবনে ভোলার দুর্গতির কথা মনে করিয়া গোপাল অত্যন্ত পুলকিত হইল। এমন কি পার্ব্বতীরও কথাটা মন্দ লাগিল না।

"দাদাবাবু, মা মরে' তারা হবে ?"

কালীচরণ বিব্রত হইয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "ও কথা বল্‌তে নেই দাদা ! তোমার মা বেঁচে থাক্‌বেন।"

কথাটা গোপাল অন্য আকারে জানিবার চেষ্টা করিল। "দাদাবাবু, মা মন্দ লোক না ভাল লোক ?"

পার্ব্বতী বস্ত্রের অন্তরালে নীরবে হাস্য করিল। কালীচরণ বলিলেন, "ভাল লোক।"

গোপাল কহিল, "তবে ত মা তারা হবে। বড় তারা হবে না, ছোট তারা হবে, না দাদাবাবু ?"

মৃত্যুর পর সুকুমারীর অদৃষ্টে তারা হওয়া যে সুনিশ্চিত, সে বিষয়ে গোপাল একেবারে নিঃসন্দেহ ছিল না। তাহার যথেচ্ছাচারিতার উপর সর্ব্বদা যে প্রতিবন্ধকতা করে এবং তাহার দাদামহাশয়ের সহিত তাহাকে যে অবাধে মিশিতে দিতেছে না, সে আর যাহাই হউক, বড় তারা হইয়া আকাশে জ্বল জ্বল করিবে না তাহা নিশ্চিত !

পার্ব্বতী কহিল, "বাবু রাত হ'ল, আজ তা হ'লে গোপালকে নিয়ে বাড়ী যাই।"

কালীচরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। তার পর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির সহিত শুধু তারকার গল্প জমিয়া উঠে না, রাতও গভীর হইয়া আসে, সে কথা কালীচরণ এতক্ষণ ভুলিয়া ছিলেন। পরদিন পুনরায় গোপালকে হেদুয়ায় বেড়াইতে লইয়া আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পার্ব্বতী গোপালকে লইয়া চলিয়া গেল। কালীচরণ গৃহে ফিরিলেন। কাশী যাইবার সঙ্কল্পে একটা মস্ত বাধা পড়িয়া গেল।

অপরাহ্নে তিনটা বাজিবার পর হইতেই কালীচরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন হইতে সময় আর কাটিতে চাহিত না। পনের মিনিট হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়ী দেখিতেন, এবং প্রত্যহই ভাবিতেন সে দিন নিশ্চয় ঘড়ী স্লো চলিতেছিল; কিন্তু ঘড়ী যে ঘণ্টায় চল্লিশ মিনিট স্লো চলিতে পারে না, এবং মন যে ঘণ্টায়

ষাট মিনিট ফাষ্ট চলিতে পারে, এ কথা একবারও মনে হইত না। চারিটা বাজিতেই কালীচরণ বাহির হইয়া পড়িতেন। পথে তখন যথেষ্ট রৌদ্র, কিন্তু সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না, ঘাম মুছিতে মুছিতে হেদুয়ার অভিমুখে ছুটিতেন, মনে হইত তাঁহারই বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, গোপাল আসিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু হেদুয়ায় পৌঁছিয়া প্রত্যহই দেখিতেন, গোপাল তখনও আসে নাই, তিনিই পূর্ব্বে আসিয়াছেন। তাহার পর হইতে গোপালের আসা পর্য্যন্ত সময়টার—ঘড়ীর আচরণ বাস্তবিকই যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিত। শব্দ হয় অথচ কাঁটা সরে না, এরূপ ঘড়ী লইয়া কোন্ ভদ্রলোক ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে! কালীচরণ ঘন ঘন ঘড়ী দেখিতেন। পাঁচটার সময় গোপালের আসিবার কথা থাকিত। কালীচরণ অন্যমনস্ক হইবার জন্য পথের লোক গুণিতেন; তাহার মধ্যে কয়জন স্ত্রীলোক, কয়জন পুরুষ, কয়জন বৃদ্ধ, কয়জন বালক, কয়জন উত্তর দিক্ হইতে আসিতেছে, কয়জন উত্তর দিকে যাইতেছে, সমস্ত মনে মনে নির্ণয় করিতেন। অবশেষে বাস্তবিকই দেখা যাইত, দূরে ফুটপাথের উপর পরিচারিকার হাত ধরিয়া একটি বালক-মূর্ত্তি অগ্রসর হইতেছে। কালীচরণের নয়ন উৎফুল্ল হইয়া উঠিত।

প্রায় একমাসের মধ্যে কেবল একদিন মাত্র গোপালের সহিত কালীচরণের সাক্ষাৎ হয় নাই। সেদিন অপরাহ্ণ হইতে আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল। দুর্য্যোগে পথে বাহির হইবার কোনও উপায় ছিল না, বাহির হইলেও গোপালের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোনও আশা ছিল না। কালীচরণের নিরুপায় দেহ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্ভ্রান্ত মন বৃষ্টিধারা ভেদ করিয়া সহস্রবার হেদুয়ার পথে যাতায়াত করিতেছিল! মানুষের মন আর

যাহাতেই ভিজুক না কেন, বৃষ্টির জলে ভিজে না, তাহা নিঃসন্দেহ; নহিলে কালীচরণের মন সেদিন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

৭

সবেমাত্র গোপাল বেড়াইয়া গৃহে ফিরিয়াছে। সুকুমারী তাহাকে লইয়া নিপীড়ন করিতেছিল। তর্জ্জন করিয়া সুকুমারী বলিল, "শীঘ্র বল্, তোকে এত লজেঞ্জুস্ কে দিয়াছে, নইলে মেরে হাড় ভাঙ্গব।"

গোপাল কাঁদ কাঁদ হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। বিপদ্ যে কিরূপ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র বাকি ছিল না। পার্ব্বতী বিপদের সূচনা হইতেই সরিয়া পড়িয়াছিল।

"শীঘ্র বল্, বল্‌ছি!"

গোপাল কথা না কহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে একটির পর একটি লজেঞ্জুস্ খসিয়া পড়িতেছিল।

ভোলা আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "আমি জানি, মা-ঠাক্‌রুণ, কে ন্যাব্যান্‌চুস্ দিয়াছেন। তোমার শ্বশুর রোজ গোপালের সঙ্গে হেদোয় দেখা করেন। তিনিই দিয়েচেন।"

অগত্যা পার্ব্বতীকেও স্বীকার করিতে হইল। সুকুমারী ছাড়িবার পাত্রী নহে।

সুকুমারীর অন্তরে যে প্রতিহিংসাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল—রাবণের চিতার মত তাহার অন্ত ছিল না। এই ক্ষীণকায়া সুদর্শনা রমণীটি ঠিক একটি সুনির্ম্মিত পরিচ্ছন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মত—যতক্ষণ শান্ত ততক্ষণ মন্দ নহে, কিন্তু যখন তড়িৎ সঞ্চালন করিবার প্রয়োজন হয় তখন ভীষণ হইয়া উঠে।

হুকুম হইয়া গেল পরদিন হইতে পার্ব্বতীর স্থলে ভোলা গোপালকে বেড়াইতে লইয়া যাইবে। ভোলার উপর যে নির্দ্দেশ করা হইল তাহার কোনও প্রয়োজন ছিল না, ভোলার নিজের বিবেচনাই সে পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

পরদিন বৈকালে কালীচরণ হেদুয়ায় বসিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন। অলক্ষ্যে গোপাল তথায় উপস্থিত হইয়া ডাকিল, "দাদাবাবু!"

কালীচরণ চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, এবং চাহিয়া দেখিয়া বোধ হয় অধিকতর চমকিয়া উঠিলেন। রজ্জু ধরিতে গিয়া রজ্জু সর্পে পরিণত হইলে যেমন হয়—কতকটা সেই প্রকার।

ভোলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ফের গোপাল কথা কচ্চ? তোমার মা না কারুর সঙ্গে কথা কইতে মানা করেছেন?"

সক্রোধে গোপাল বলিল, "চুপ্ কর্ চামচিকে! বেশ কর্‌ব কথা ক'ব!"

ভোলা সজোরে গোপালের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। "চল তোমার মার কাছে—মেরে আজ হাড় গুঁড়ো কর্‌বেন!"

গোপালের আর্ত্তনাদে হেদুয়া সচকিত হইয়া উঠিল, এবং ভোলার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য গোপাল প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন ফল হইল না। ভোলা গোপালকে উদ্যানের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল।

মুহূর্ত্তের জন্য কালীচরণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্রোধে ও অপমানে সমগ্র বিশ্ব তাঁহার পক্ষে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝড়ের মত উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দিবালোকে পথের গ্যাস তখন পাণ্ডু হইয়া জ্বলিতেছিল।

৮

ভোলা যখন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কালীচরণের অপমানের কাহিনী বর্ণনা করিতেছিল এবং দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গোপাল রুদ্ধ ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল—তখন সুকুমারীর অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে যে অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাকে ঠিক অমিশ্র তৃপ্তি বলা চলে না। একটি নিরীহ বৃদ্ধ এবং একটি নিরপরাধ শিশুর বিরুদ্ধে অকারণে সে যে নির্যাতন আরম্ভ করিয়াছে—তাহার নির্ম্মমতার বেগ সহজে সহ্য করিবার পক্ষে তাহার যথোপযুক্ত শক্তি ছিল না; কিন্তু যে পাপকে সে নিজে প্রশ্রয় দিয়াছে—যাহাকে সে স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছে, প্রকাশ্যভাবে তাহাকে প্রতিবাদ করিতেও তাহার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল; শুধু মনে হইতেছিল, ভোলাটা বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, ধরিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে।

তাহার পর প্রায় একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে—ইহার মধ্যে একদিনও কালীচরণকে হেদুয়ার নিকটে দেখা যায় নাই। ভোলা বলে, কালীচরণ খুব জব্দ হইয়া গিয়াছেন! কিন্তু জব্দ বাস্তবিক কে হইতেছিল, সে সংবাদ একমাত্র বিধাতাপুরুষই অবগত ছিলেন! কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়, কোথাকার টান কোথায় পড়ে, কোথাকার আঘাত কোথায় ফিরিয়া আসে, এ সকল তথ্য ভোলার ত ভুল হইবারই কথা, যাহারা বাস্তবিক ভোলা নহে, তাহারাও সব সময়ে বুঝিতে পারে না।

একদিন সুকুমারীর পিত্রালয়ে সংবাদ উপস্থিত হইল, অজয়নাথ সঙ্কটাপন্নরূপে পীড়িত হইয়া কলিকাতার গৃহে আসিয়াছেন। সুকুমারী গোপনে সংবাদ লইয়া জানিল কথাটা সত্যই বটে—তবে শুধু সঙ্কটাপন্ন

নহে—তদপেক্ষাও গুরুতর। জীবন ও মৃত্যু পরস্পরে প্রবলভাবে টানাটানি করিতেছে! আকুল প্রতীক্ষায় সুকুমারী তিন দিন অতিবাহিত করিল, কিন্তু কেহ ডাকিল না, কেহ সংবাদ দিল না, কেহ আসিল না! শুধু মনে হয়, কে যেন কোথায় কাঁদিতেছে—শুধু মনে হয়, বিপদ্ যেন চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘিরিয়া আসিতেছে। এ যেন পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের মত! অভিমান অটুট রাখিবার শক্তি লুপ্ত হইয়াছে, অথচ চক্ষুলর্জ্জাও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা ও সঙ্কোচের মধ্যে দিবারাত্র অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে—ইচ্ছা যতটা টানিয়া লইয়া যায়, সঙ্কোচ ততটা পিছাইয়া আনে।

তিন দিনের দীর্ঘ অবসরে সুকুমারীর লুপ্ত নারীত্ব ধীরে ধীরে কতকটা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। পুত্রের প্রতি সে গুরুতর উৎপীড়ন করিয়াছে—নিরীহ শ্বশুরকে সে অকাতরে অপমানিত করিয়াছে—অবশেষে স্বামী এখন কঠিন রোগে শয্যা গ্রহণ করিয়াছে, কে জানে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিবে কি না! দিনের মধ্যে শতবার সুকুমারী শিহরিয়া উঠে, আর মনে হয় বিধাতার দণ্ড যেন তাহার মস্তকে পড়িতেছে—কর্ম্মফল যেন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে!

সমস্ত রাত্রি শয্যায় নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটাইয়া—অতি প্রত্যূষে সুকুমারী শয্যাত্যাগ করিল। পূর্ব্বগগনের অন্ধকার তখন সবেমাত্র ধূসর হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত গৃহ নিদ্রামগ্ন। সুকুমারী ভোলাকে জাগাইয়া শীঘ্র একখানা গাড়ী আনিবার আদেশ দিল। গাড়ী যখন আসিল, তখন সুকুমারী গোপাল ও তাহার শিশুকন্যাকে লইয়া প্রস্তুত হইয়াছে।

সুকুমারী ভোলাকে বলিল, "মাকে গিয়ে বল্, আমি শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি।"

ভোলা বলিল, "আমিও যাব ত মা?"

সুকুমারী বলিল, "না, তুই যাবিনে। মহেশ যাবে।"

৯

কালীচরণের গৃহে তখন একটি কষ্টকাতর জীবন তাহার শেষ নিঃশ্বাসগুলি ধীরে ধীরে নিঃশেষিত করিয়া লইতেছিল। বিনিদ্র গৃহে একটা নিষ্ঠুর সম্ভাবনার আশঙ্কায় উষার স্তিমিতালোকে উদাস, স্তব্ধ হইয়াছিল। একখানা গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল।

কালীচরণ উন্মত্তের মত দৌড়িয়া আসিয়া দ্বার খুলিলেন। "ডাক্তারবাবু, শীঘ্র আসুন !"

কিন্তু ডাক্তারবাবু ত নহে, একটি রমণী একটি বালকের হাত ধরিয়া দীনভাবে অপেক্ষা করিতেছিল।

কালীচরণ কঠিন হইয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

"বাবা !"

"কে, বৌমা ?"

"হ্যাঁ বাবা।"

কালীচরণের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল !

"সে হবে না বৌমা ! তোমাকে এই গাড়ীতেই বাপের বাড়ী ফিরে যেতে হবে। যখন তোমার ছেলের সঙ্গে আমাকে দেখা কর্‌তে দাও নি—তখন ভুলে গিয়েছিলে যে আমারও ছেলে আছে। আমার ছেলের সঙ্গে তোমার দেখা হবে না, যাও গাড়ীতে গিয়ে ওঠ !"

গৃহমধ্যে সহসা ক্রন্দনের রোল উঠিল—এবং তাহার মধ্য দিয়া যে কয়েকটি বাক্য শ্রবণে আসিয়া পৌছিল, তাহা শুনিয়া সুকুমারীর হতচেতন দেহ কালীচরণের পদতলে লুটাইয়া পড়িল !

প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ সুকুমারীর সুবর্ণবলয়ের উপর প্রতিফলিত হইয়া ঝিক্ ঝিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

অর্থমনর্থম্

ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষার ফল জানিয়া দেশে ফিরিলাম। মেডিকাল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া কতকটা কৃপণের বাড়ী ভোজ খাওয়ার মত। আচমন করিবার পূর্ব্বে তাহা কোন মতেই প্রত্যয় করা চলে না। তাই কলেজের নোটিস-বোর্ডে ছাপার অক্ষরে যেদিন আমার নাম দেখা গেল, তাহার পরদিন দীর্ঘ ছয় বৎসরের বাসার সহিত সবরকম দেনাপাওনা মিটাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পরীক্ষার পর, বিশেষতঃ পরীক্ষা পাশ করার পর, দেশে যাওয়া ছাত্র-জীবনের চিরাগত প্রথা—তাহার মধ্যে কিছুই অপূর্ব্ব ছিল না। কিন্তু আমার দেশে যাওয়ার মধ্যে সে সহজ চিরন্তন কারণ ছাড়া গুরুতর কারণও বিদ্যমান ছিল। কিছুদিন হইতে দেশে যাইবার জন্য একটু বিশেষভাবে আমার ডাক পড়িয়াছিল, এবং সে ডাকের মধ্যে যে বিশেষ উদ্দেশ্যটি নিহিত ছিল, তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিবার পক্ষে যতটুকু বুদ্ধি এবং অনুমান-শক্তির প্রয়োজন তাহার অভাব আমার ঘটে নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম, বিবাহের জন্য আমার ডাক পড়িয়াছে। যাঁহারা আমাকে ডাকিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি, অথবা তাঁহাদের ডাকার উদ্দেশ্যের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা ছিল না। কারণ, মেডিকাল কলেজের ছয় বৎসরের অনবসরের মধ্যে, বিবাহ করিব না, এইরূপ একটা লোমহর্ষণকারী কাব্য আমার চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা খুঁজিয়া পায় নাই। শৈশব হইতে নিতান্ত সাদাসিধাভাবেই মানুষ হইতেছিলাম; লেখাপড়া শেষ করিয়া বিবাহ করিব এবং তাহার

পর যথানিয়মে পিতা হইতে পিতামহ হইয়া মানবলীলা সংবরণ করিব, এইরূপ একটা নিতান্ত সহজ এবং সাধারণ ধরণের জীবন-কল্পনা আপনা-আপনিই আমার মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই, প্রথম যে দিন মেডিকাল কলেজের ছাড়-পত্র পাইলাম, বিলম্ব না করিয়া তাহার পরদিনই তল্পিতল্পা লইয়া দেশে রওনা হইলাম।

দেশে আসিয়া দেখিলাম, আমার অনুমান ভুল হয় নাই; বিবাহই বটে। তবে শুধু বিবাহ বলিলে সবটুকু বলা হয় না। তাহার সহিত আরও একটি বৃহত্তর এবং মহত্তর উদ্দেশ্য সফল হইবার অপেক্ষায় ছিল। আমার পিতা দরিদ্রই ছিলেন, এবং আমার ডাক্তারী পড়ার অমিত ব্যয়ভার বহন করিয়া সে দারিদ্র্য হ্রাস পায় নাই, তাহাও সত্য। সেই বহুকষ্ট-অর্জ্জিত ডাক্তারী-শিক্ষাকে প্রথম হইতেই সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে পিতা আমার দ্বারা আমাদের সংসারকে দারিদ্র্য-রোগ হইতে নিরাময় করিয়া লইবার জন্য একটি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একটি মানুষের পরিবর্ত্তে একটি পরিবারের চিকিৎসার ভার আমার উপর সর্ব্বপ্রথম পড়িয়াছিল।

আমাদের গ্রামের যিনি জমিদার, তাঁহার অবিবাহিতা কিন্তু বিবাহ-যোগ্যা একটি কন্যা ছিল। সেই কন্যাটি তাঁহার একমাত্র কন্যা, যদিও একমাত্র সন্তান নহে। শুনিলাম, সেই কন্যাটির সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে, এবং রূপে ও গুণে কন্যাটি লক্ষ্মীস্বরূপা। রূপে লক্ষ্মী, সে কথা আমার শুনিয়াই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু গুণে যে লক্ষ্মী সে বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ ছিল না, কেননা কথা হইয়াছিল, দশ হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার অলঙ্কার লইয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মী আমাদের গৃহে শুভাগমন করিবেন, এবং তাঁহার পিতা অর্থাৎ আমার ভাবী শ্বশুর, কলিকাতায় থাকিয়া ডাক্তারী ব্যবসায়

চালাইবার মত আমার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এমন কথাও নাকি তিনি বলিয়াছিলেন যে, যতদিন আমি স্বাবলম্বী না হইব ততদিন তিনি আমাকে মাসহারা দিবেন। আমার প্রতি এই বিপুল কৃপাবর্ষণ করিবার কারণ এই যে, তাহা হইলে তাঁহার কন্যাটি পরের হাতে পড়িয়াও পর হইবে না, এবং যাহার হাতে পড়িবে তাহার মত দ্বিতীয় পাত্র আমাদের অঞ্চলে বাহির করা যে অসম্ভব ছিল, তাহা শত্রুপক্ষেরও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। তখন অকাল চলিতেছিল, তাই দিন পনের পরে কন্যাপক্ষ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন কথা ছিল, এবং তাহার দশ পনের দিন পরেই বিবাহ।

বাঙ্গালাদেশে পুরুষমানুষের বিবাহ কঠিন ব্যাপার নহে, বিশেষতঃ সেই সকল পাত্রের পক্ষে যাহাদের কপালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষ ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়ার মধ্যে আনন্দের কথা থাকিলেও বিস্ময়ের কথা কিছুই ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোত্তম পাত্রের জন্যও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ যতটা করিয়া যাইতে পারেন নাই, আমার জন্য পিতা তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন! তাই, যে কিশোরীটির আমাদের অন্তঃপুরে এবং আমার হৃদয়পুরে প্রবেশ করিবার কথা ছিল, তাহার প্রবেশের জন্য আমরা ততটা ব্যগ্র হই নাই, যতটা হইয়াছিলাম সেই সকল সামগ্রীগুলির জন্য যাহাদের লোহার সিন্দুকে প্রবেশ করিবার কথা ছিল। অর্থাৎ হৃদয়ের কবাট সুযোগমত মুক্ত হইবার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু সিন্দুকের কবাট আমরা পূর্ব্বাহ্লেই খুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

নগদ দশ হাজার টাকার মধ্যে পছন্দর কোন কথা ছিল না। আমাদের সংসারের ইতিহাসে এমন কোনও বড়লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি তাহা পছন্দ না করিতেন। তাই, টাকা এবং অলঙ্কারের

সহিত রক্তমাংসের যে পদার্থটির আসিবার কথা ছিল, সংসারের লাভের খাতে তাহাকে স্থান দেওয়া হয় নাই; সকলেই সোনা এবং রূপার স্বপ্ন দেখিত। এমন কি আমারও কানে মলের রুনুঝুনু অপেক্ষা টাকার ঝন্‌ঝনানিটাই বেশী বাজিত এবং নিরালা গৃহকোণে নোলকপরা একটি ঢলঢলে মুখ অপেক্ষা জমিদার শ্বশুর মহাশয়ের পুষ্ট গুম্ফের চিত্র বেশী মনে পড়িত।

আমাদের সংসারে সকলের মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন ঘটনাস্রোত ধীরে ধীরে অন্যদিকে ফিরিবার উপক্রম করিল। সুবিধার পূর্ণিমায় আমাদের শীর্ণ সংসারে যে রূপার বান ডাকিবার কথা ছিল, দিনের পর দিন পলি পড়িয়া তাহার পথ বন্ধ হইয়া গেল। কেমন করিয়া, এইবার সেই কথা বলিব।

ডাক-টিকিট কিনিবার জন্য সেদিন গ্রামের ডাকঘরে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া গৌরবর্ণ প্রৌঢ় একটি ভদ্রলোক সম্মুখে টাকা পয়সা সাজাইয়া নিবিষ্টমনে হিসাব মিলাইতেছেন। বুঝিলাম, তিনিই পোষ্টমাষ্টার এবং নূতন আসিয়াছেন। পাঁচটা বাজিতে তখন বেশী বিলম্ব ছিল না। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি চাই আপনার?"

আমি কহিলাম, "চা'রখানা দু'পয়সার টিকিট।"

গণনার মধ্যে ফরমাইস করিয়া ভদ্রলোককে একটু বিব্রত করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিলাম। তিনি একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, একবার হিসাব এবং টাকাপয়সার দিকে চাহিয়া একটু চিন্তা করিলেন, তাহার পর ঘরের এক দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মনু-মা, এই চা'রখানা টিকিট বাবুকে দাও ত।"

একটি চৌদ্দ পনের বছরের মেয়ে, পোষ্টমাষ্টারের নিকট হইতে

চারিখানি টিকিট লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল; আমার হাতে টিকিট কয়খানি দিয়া তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটির গভীর দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মূল্যের অপেক্ষায় চাহিয়া রহিল; এবং আমার নিকট হইতে মূল্য পাইবামাত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে পিতার টেবিলে তাহা স্থাপন করিয়া ঘরের কোণে মিশাইয়া গেল। টিকিট লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

দুইদিন পরে পুনরায় টিকিট কিনিবার জন্য ডাকঘরে উপস্থিত হইলাম। সেদিন পোষ্টমাষ্টার ব্যাপৃত ছিলেন না, তিনি স্বয়ং উঠিয়া টিকিট দিলেন। খামে টিকিট মারিয়া বাক্সের ভিতর ফেলিয়া গৃহে ফিরিব, এমন সময় বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। সেই স্বল্প-পরিসর ডাকঘরের বারাণ্ডায় অপেক্ষা করিব, না গাত্রবস্ত্র মাথায় দিয়া গৃহে ফিরিব, ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় পাশের ঘরের দ্বার খুলিয়া পোষ্টমাষ্টার আহ্বান করিলেন।

"আসুন, ভিতরে বস্‌বেন আসুন; বৃষ্টি থাম্‌লে যাবেন।"

আমি কহিলাম, "আপনি ব্যস্ত আছেন, আপনার সময় নষ্ট কর্‌ব না।"

পোষ্টমাষ্টার মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, "সময় নষ্ট হবে না। আপনি দু'মিনিট বসুন, আমি মেল রওয়ানা করে দিয়েই আস্‌চি। তার পর আমার ছুটি।"

তখন বাহিরে বৃষ্টি একটু জোরেই আসিয়াছিল, আতিথ্য-গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। ঘরের ভিতরে গিয়া একটা চেয়ারে স্থান গ্রহণ করিলাম। পোষ্টমাষ্টার আমার সম্মুখে একখানা খবরের কাগজ আগাইয়া দিয়া একটু উচ্চস্বরে কহিলেন, "মনু, এখানে পান দিয়ে যাও ত মা!" বলিয়া তিনি মেল রওয়ানা করিতে চলিয়া গেলেন।

কিছু পরে পূর্ব্বদিনের পরিচিত সেই মেয়েটি একটি ডিবায় কতকগুলি পান আমার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার আসা ও যাওয়ার মধ্যে কোন প্রকার সঙ্কোচ বা চঞ্চলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না; যেমন সহজ, তেমনি ধীর। গঠনটি ছিপ্‌ছিপে, বর্ণটি অরুণাভ, এবং যতটুকু দেখিতে পাইয়াছিলাম মুখখানি ফুটন্ত ফুলের মত ঢল্‌ঢলে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া সহজ ঋজু ভঙ্গীখানি। খুব যে সুন্দরী তাহা নহে, কিন্তু দেখিলে তখনি যেন আবার দেখিতে ইচ্ছা করে।

একটা পান মুখে পূরিয়া খবরের কাগজ পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় পোষ্টমাষ্টার মেল রওয়ানা করিয়া আসিয়া বসিলেন।

শিষ্টাচার এবং আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে আমি কপট বিনয়ের ভঙ্গীতে কহিলাম, "আপনাকে নিতান্ত বিব্রত করেছি।"

পোষ্টমাষ্টার সহাস্যে কহিলেন, "তার চেয়েও বিব্রত আপনাকে করতাম যদি এই বৃষ্টিতে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে গিয়েও যদি আপনার বিশেষ কোন সুবিধা বা উপকার হ'ত তা হ'লে বল্‌তে হবে আমিই আপনাকে বিব্রত করেছি।" বলিয়া তিনি উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

যখন দেখা গেল কেহ কাহাকেও বিব্রত করি নাই, তখন পোষ্টমাষ্টার বেশ জমাইয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। বাহিরে বৃষ্টিও বেশ জমিয়া আসিয়াছিল।

পোষ্টমাষ্টার এবং স্কুলমাষ্টার সম্বন্ধে আমার প্রায় অভিন্ন সংস্কার ছিল। উভয়ের কথা মনে হইলেই নিরীহ অথচ রুক্ষ স্বভাবের প্রাণীর কথা আমার মনে হইত। ইঁহার সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পরই কিন্তু বুঝিতে পারিলাম ইনি দলছাড়া লোক। রুক্ষ ত নিশ্চয়ই নহেন,

বাক্যে এবং ব্যবহারে ইঁহার মত মসৃণ ব্যক্তি আমি দ্বিতীয় দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না ; এবং নিরীহ শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছি তাহাও ইঁহার উপর প্রয়োগ করা কোন মতে চলে না।

বাহিরে বৃষ্টি বোধ হয় থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমার সেদিকে মন ছিল না। আমি তন্ময় হইয়া পোষ্টমাষ্টারের গল্প শুনিতেছিলাম। নিত্যকার সংসারের তুচ্ছ সুখদুঃখের সাধারণ গল্প তিনি করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতেই আমার মন এমন বসিয়া গিয়াছিল যে, আমাদের কথাবার্তার মধ্যে কোন্ সময়ে পোষ্টমাষ্টারের কন্যাটি ঘরে প্রবেশ করিয়া এক কোণে টেবিলের সম্মুখে একখানি বই লইয়া বসিয়াছে, তাহা আমি লক্ষ্যই করিতে পারি নাই। পাশ হইতে তাহার মুখের একটা দিক দেখা যাইতেছিল, এবং কেরোসিন ল্যাম্পের উজ্জ্বল প্রভায় সেই আধখানি-দেখা মুখ একটি কমনীয় শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই মেয়েটি আমার নিকটে একটি রহস্যের মত হইয়া উঠিতেছিল। সে যে পোষ্টমাষ্টারের কন্যা তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু শুধু সেই পরিচয়েই নিবৃত্ত হইতে পারিতেছিলাম না। ইচ্ছা হইতেছিল, পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সকল সংবাদ অবগত হই ; কিন্তু কোন মতেই তাহা পারিয়া উঠিতেছিলাম না। আমার নিজের বিবাহের বয়স উপস্থিত হইয়া রহিয়াছে এবং অবিবাহিত জীবনের সীমা অতিক্রম না করায় এখনও নাবালকের শ্রেণীভুক্ত হইয়া রহিয়াছি ; এরূপ একটা অপরাধের জ্ঞান মনের মধ্যে সজাগ থাকায়, একটি প্রাপ্তবয়স্কা এবং সুন্দরী বালিকার কথা উত্থাপন করিতে সঙ্কুচিত হইতেছিলাম। মনে হইতেছিল, তাহা হইলে তখনই বিশ্বসংসার মনে মনে নিশ্চয় আমাকে সন্দেহ করিয়া বসিবে।

কিন্তু কিছু পরে পোষ্টমাষ্টার স্বয়ং কন্যার কথা তুলিলেন। সেইটিই

তাঁহার একমাত্র দুহিতা এবং একমাত্র সন্তান। মাতৃহীনা হওয়ার পর হইতে তাঁহাকে পিতা এবং মাতা উভয়ের স্থান গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু মেয়েটি যেমন ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে ততই যেন তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্কটা বিপরীত হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাই তিনি মা ভিন্ন অপর সম্বোধন আর বড় ব্যবহার করেন না; বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

একজন অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে নিজের বিষয়ে এরূপ অবাধ আলোচনা আরম্ভ হইল দেখিয়া 'মনু' (পরে জানিয়াছিলাম মনোরমা) একটু যেন বিব্রত হইয়া উঠিল, এবং দুই একবার একটু নড়িয়া চড়িয়া ইতস্ততঃ করিয়া পালাইয়া বাঁচিল।

প্রসঙ্গ উঠায় আমি সাহস করিয়া কহিলাম, "এ মেয়েটি যখন বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী যাবে, তখন দেখ্‌চি আপনার দিন কাটান ভার হবে!"

পোষ্টমাষ্টার আমার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন; কহিলেন, "সে দুঃখ ত পরের কথা। তার জন্যে তত ভাবনা হয় না। সেই দুঃখ ভোগ কর্‌বার অবস্থায় কি উপায়ে উপস্থিত হ'ব তাই হয়েচে এখনকার ভাবনার কথা। আহার কর্‌লে বদহজম হবাব ভয় ত আছেই, কিন্তু সেই আহার্য্য সংগ্রহ কর্‌বার দুশ্চিন্তাও তাব চেয়ে কম প্রবল নয়!"

আমি কহিলাম, "কিন্তু আপনার এ মেয়েটির পক্ষে সে ভাবনার কোন কারণ নেই ব'লে আমার মনে হয়। আপনার মেয়েকে দেখে কেউ অপছন্দ কর্‌বে না।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আপনি যে কথা বল্‌ছেন সে কথা বাঙ্গালাদেশের পক্ষে খাটে না। টাকা দিয়ে যে দেশে জামাই কেন্‌বার প্রথা চলেছে, সেখানে টাকার উপরই সব নির্ভর করে। আমার এ

কথার প্রমাণস্বরূপ আপনাদের গ্রামেই একটা নজীর দেখাতে পারি। এই গ্রামের কোন ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল ; পাত্রের দামও স্থির হয়ে গিয়েছিল তিন হাজার টাকা। ছেলেটি তখন ডাক্তারী-পরীক্ষা দেবার জন্য কলিকাতায় ছিল ব'লে আমি আমার একজন বন্ধুকে চিঠি লিখে দিই। সে মেসে গিয়ে ছেলে দেখে এসে আমাকে জানায় যে পাত্রটি ভাল, দরে বিকে'বার যোগ্য। কাজেই আমার মত লোককে তিন হাজার টাকাতেও রাজি হ'তে হয়েছিল। সমস্তই ঠিক হয়ে রইল, শুধু পাত্র এলে উভয় পক্ষে আশীর্ব্বাদ হয়ে যাবে। এমন সময় গ্রামের জমিদার সেই পাত্রের উপর দশ হাজার, বিশ হাজার, কি একটা মস্ত দর হাঁক্‌লেন। কথার মূল্যের চেয়ে চাঁদির মূল্য ঢের বেশী। কাজেই কথা যা ছিল তা বদলে যেতে কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না। পাত্রের পিতা আমাকে লিখ্‌লেন, তিনি দুঃখিত কিন্তু অক্ষম। দুঃখিত কথাটা একেবারে মিথ্যা, কিন্তু তিনি যে অক্ষম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না!" এই বলিয়া পোষ্টমাষ্টার উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

আমি জানি না কেমন করিয়া আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "অন্যায়, ভয়ানক অন্যায়!" এবং একটা অপমান ও হীনতার বেদনায় আমার সমস্ত দেহ ভরিয়া উঠিল।

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "ন্যায় অন্যায়ের বিচার ছেড়ে দিলেও অবস্থা ত এই! এতে আপনি কি ক'রে বলেন যে, মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে আমার কোন ভাবনার কারণ নেই?"

পোষ্টমাষ্টারের কথা ভাল করিয়া আমার কানে প্রবেশ করিতেছিল না। বিরক্তি, ক্রোধ ও লজ্জায় আমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এ আচরণ যে সামান্য সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে হইলেও

লজ্জাজনক হইত। ভদ্রলোকের কথা এবং ভদ্রলোকের কন্যা কি এমনই তুচ্ছ জিনিষ যে তাহা লইয়া যেমন ইচ্ছা খেলা করা চলে! সে সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব, কোন সম্ভ্রমের প্রয়োজন হয় না! পিতার এই ব্যবহার স্মরণ করিয়া যতই মর্ম্মাহত হইতে লাগিলাম, মনোরমার সকরুণ মূর্ত্তিখানি ততই আমার মর্ম্মের মধ্যে অধিকার স্থাপন করিতে লাগিল। এই মনোরমা, যে আমার মনের অগোচরে এই দুই দিনে আমার হৃদয়ের মধ্যে এমন প্রবলভাবে অধিকার স্থাপন করিয়াছে, সেই মনোরমা তাহার সমস্ত সম্পদ এবং সমস্ত মাধুর্য্য লইয়া আমার আশ্রয়ে উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু অর্থের লালসা তাহাকে ঘৃণিতভাবে ফিরাইয়া দিয়াছে!

তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। কিন্তু আর অপেক্ষা করিব না স্থির করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বিশেষতঃ, পোষ্টমাষ্টারের নিকটে পাছে আত্মপরিচয় দিতে হয় সেই ভয় হইতেছিল।

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "বৃষ্টি এখনও থামেনি, এখনই কেন উঠ্‌ছেন ?"

আমি কহিলাম, "এ বৃষ্টি থাম্‌তে বিলম্ব আছে, আর দেরি কর্‌ব না।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "নিতান্ত যদি যাবেন তা হ'লে একটা ছাতি নিয়ে যান ; কাল পাঠিয়ে দেবেন।" এই বলিয়া আমার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "মনু,—আমার ছাতিটা দিয়ে যাও ত মা!"

মনোরমা একটি ছাতি লইয়া উপস্থিত হইল এবং সেটা আমার সম্মুখে রাখিয়া তাহার পড়িবার স্থানে গিয়া বসিল।

কিন্তু মনে মনে যাহা ভয় করিতেছিলাম তাহাই ঘটিল। পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আপনার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ কর্‌লাম, কিন্তু নামটি জানা হয় নি ত ?"

কি করিব প্রথমটা ঠিক করিতে পারিলাম না। কিন্তু তখনই সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলাম, "আমার নাম বিনয়ভূষণ মিত্র।"

পোষ্টমাষ্টার যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "আপনার পিতার নাম ?"

"শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মিত্র !"

পোষ্টমাষ্টার ক্ষণকাল বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তাই বুঝি ? তবে ত বেশ হয়েছে দেখ্‌চি ! কিন্তু কিছু মনে কর্‌বেন না, আমি একটি কথাও অযথা বলি নি।"

দেখিলাম, মনোরমা ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এবং মনে হইল, তাহার মুখেও যেন কৌতুকের একটি ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমি কহিলাম, "আপনি অযথা কিছুই বলেন নি। এ বিষয়ে আমার যা বক্তব্য তা পরে জানাব।" বলিয়া প্রস্থান করিলাম।

বিপিন আমার খুড়তাত ভাই। আমরা প্রায় সমবয়স্ক, তাই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা বন্ধুর মত দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ী গিয়া বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানকার পোষ্টমাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল ?"

বিপিন কহিল, "তা তুমি জান না ? কথা হয়েছিল কেন, স্থিরই ত হয়ে গিয়েছিল।"

"তবে ভাঙ্গল কেন ?"

বিপিন কহিল, "আরও ভাল জুটে গেল ব'লে ভাঙ্গল।"

"আরও ভাল কিসে ?"

"টাকায়।"

"তা হ'লে এখন যদি রাজার মেয়ে জুটে যায় তা হ'লে এ সম্বন্ধও ভেঙ্গে যাবে ?"

বিপিন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "তা যেতে পারে।"

আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতেছিল। পোষ্টমাষ্টার যে বলিয়াছিলেন, কথার চেয়ে চাঁদির মূল্য ঢের বেশী, তাহা আমার কানে তখনও বাজিতেছিল। কহিলাম, "তা যদি যেতে পারে ত তাই যাক, আমি জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করব না।"

বিপিন হাসিয়া কহিল, "কেন ? রাজার মেয়ে জুটেছে না কি ?"

আমি কহিলাম, "হাঁ জুটেছে। রাজা আমাদের গ্রামের পোষ্টমাষ্টার, আমি তাঁর মেয়েকেই বিয়ে করব !"

বিপিন কহিল, "তা হ'লে শুধু টাকায় নয়, সবদিকেই তুমি ঠক্‌বে।"

আমি কহিলাম, "তা হ'লে মান বজায় থাক্‌বে। টাকার চেয়ে যে ভদ্রলোকের কথার মূল্য কম সেটা প্রমাণ হবে না।"

বিপিন কহিল, "সে যা হোক, এসব কথা তুমি শুন্‌লে কার কাছে ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া দেখিলাম, গোপন করিবার কোন কারণই নাই। কহিলাম, "স্বয়ং পোষ্টমাষ্টারের কাছে, আমি তাঁর বাড়ী আজ প্রায় দু'ঘণ্টা ছিলাম।"

বিপিনের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, পোষ্টমাষ্টারের মেয়েকে দেখেচ ?"

"দেখেচি।"

"ওঃ তাই বল ! পোষ্টমাষ্টারের মেয়েকে দেখে তোমার মনে প্রেম হয়েছে, তাই তোমার মাথার মধ্যে ন্যায়ের সেপাইগুলো হঠাৎ দাপাদাপি লাগিয়ে দিয়েছে ! জমিদারের মেয়েকে যদি প্রথমে দেখ্‌তে তা হ'লে এ রকমটা হ'ত না।"

বিপিনের সহিত শুধু নয়, গৃহের আরও কয়েক জনের সহিত এ বিষয়ে কথা হইল। পিতার কর্ণেও যে কথাটা পঁহুছিল তাহার প্রমাণ পাইলাম স্বয়ং পোষ্টমাষ্টারের নিকট হইতে দিন দুই তিন পরে।

পোষ্টাফিসে চিঠি ফেলিবার অছিলায় বৈকালে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

পোষ্টমাষ্টার সাক্ষাৎ হইতেই কহিলেন, "আপনি এদিকে আসা বন্ধ করুন, এখানে ছেলেধরার ভয় হয়েছে!" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

এ কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া কহিলাম, "কি রকম?"

পোষ্টমাষ্টার সহাস্যে কহিলেন, "আজ সকালে আপনার পিতার সহিত পথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর মুখে শুন্‌লাম আমি নাকি ছেলেধরা হয়েছি, আর আপনাকে ধর্‌বার চেষ্টায় ব্যস্ত আছি। তাঁর মন থেকে এ অমূলক আশঙ্কা দূর কর্‌বার অভিপ্রায়ে তাঁকে জানিয়েছি যে, আমার ডাকঘরে দু'শ পাঁচশ টাকা ধর্‌বার মতন থলেই আছে, তার মধ্যে এম-বি-পাশকরা বলিষ্ঠ ছেলেকে ধরা সম্ভব নয়। জমিদারবাড়ী বিশহাজার, পঁচিশহাজারের থলে আছে, সেখানে সে ব্যাপারটা খুব সম্ভব।" বলিয়া পোষ্টমাষ্টার উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

পাশের ঘর হইতে চাপা হাসির শব্দ শুনা গেল না বটে, কিন্তু চুড়ি বালার ঠুংঠাং মৃদুমধুর শব্দের মধ্যে একটি কৌতুকস্মিত মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল।

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "কিন্তু আর একদিক থেকে দেখ্‌লে এটা খুব স্বাভাবিকও বটে। আমি ঠকেছি ব'লে ওঁদের মনে মনে একটা আশঙ্কা আছে, পাছে আমিও ঠকাই।"

তিন দিন পরে পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আজ আবার এক নূতন

ঘটনা ঘটেছে। সকাল বেলা জমিদারের এক গোমস্তা এসে হাজির। তাকে দিয়ে জমিদার মশায় ব’লে পাঠিয়েছেন যে, আমি যদি বেশী চালাকি করি তা হ’লে গ্রামে বাস করা আমার দায় হবে। চালাকিটা কি জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লে, আমি নাকি আপনাকে ক্ষেপাচ্ছি। তার উত্তরে আমি ব’লে পাঠিয়েছি যে, জমি মাত্রেই জমিদার ব’লে একপ্রকার জীব থাকে তা আমি এ গ্রামে এসে নতুন দেখ্‌ছিনে এবং সে সম্বন্ধে আমার বিভীষিকাও তেমন নেই, সুতরাং ওকথা ব’লে ভয় দেখিয়ে কোন ফল হবে না। তার চেয়ে জমিতে আর একপ্রকার জীব চরে বেড়ায় তার শিং দেখ্‌লে অনেক সময় মনে বাস্তবিক ভয় হয়। ক্ষেপানর কথায় বলেছি যে, জমিদার যাঁর কথা ব’লে পাঠিয়েছেন তাঁর কথা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু জমিদার মশায় স্বয়ং যে ক্ষেপেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।”

আমি কহিলাম, “এ কথা ব’লে আপনি জমিদারকে ক্ষমা করেছেন মাত্র। তার ঔদ্ধত্যের কোন দণ্ডই দেওয়া হয় নি। আমি যদি সে সময়ে উপস্থিত থাকৃতাম তা হ’লে গোমস্তাকে অত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না।”

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, “রামচন্দ্রঃ! ঝগড়া ক’রে কি হবে। ও একটা পরিহাসের মত ক’রে জবাব দেওয়া গেল। আপনার বিবাহের রাত্রে সেখানে গিয়ে দু’খানা লুচি চিবতে হবে তার পথটাও রাখা চাই ত?” বলিয়া পোষ্টমাষ্টার তাঁহার স্বভাবানুরূপ উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

উৎসাহে এবং আত্মসম্ভ্রমের তাড়নায় আমার মনের মধ্যে একটা প্রবল ঝোঁক আসিয়াছিল। কহিলাম, “এখনও ও পরিবারে আমার বিয়ে কর্‌বার প্রবৃত্তি আছে, আমাকে এতটা নীচ মনে ক’রে আমার প্রতি অবিচার কর্‌ছেন!”

পোষ্টমাষ্টার আমার কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; কহিলেন, "না, না, ও কথা বল্‌বেন না, তা হ'লে আমার নামে যে সব দুর্নাম রটেছে সেগুলোর ভিত্তি বেঁধে যাবে। এতে আর জমিদার মশায়ের বিশেষ দোষ কি আছে? সকলেই যাতে নিজের অনিষ্ট বা ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হয়।"

কিন্তু পাঁচ দিন পরে পোষ্টমাষ্টারের মুখে যে কথা শুনিলাম তাহাতে ধৈর্য্য রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেদিন সন্ধ্যার পর পোষ্টাফিসে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পোষ্টমাষ্টার টেবিলের সম্মুখে বসিয়া পত্র লিখিতেছিলেন এবং মনোরমা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পত্রের দিকে চাহিয়া ছিল। পোষ্টমাষ্টার আমাকে দেখিয়া আহ্বান করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই বুঝিলাম, পিতা ও কন্যা উভয়েরই মুখ বিষণ্ণ, চিন্তাক্রান্ত। পোষ্টমাষ্টার তাঁহার অভ্যাসানুযায়ী একবার হাসিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু বর্ষা-দিনের রৌদ্রের মত সে ফিকা হাসি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী হইল; এবং বেদনার মূর্ত্তিই তাহার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

আমার মুখের ভাবে পোষ্টমাষ্টার বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন; কহিলেন, "বিনয়বাবু, আপনাদের জমিদার আমাকে শুধু গ্রামছাড়া ক'রেই নিশ্চিন্ত হ'তে পাচ্ছেন না, সরকারের অতিথিশালায় যাতে আমার একটা স্থান হয় তার বন্দোবস্তও তিনি ক'রে দিচ্ছেন!"

আমি ব্যগ্রভাবে কহিলাম, "আবার কি হয়েছে?"

পোষ্টমাষ্টার তাঁহার তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া কহিলেন, "আমি জমিদারের দু'শ টাকা চুরি করেছি! মাস খানেক হ'ল জমিদারের নামে দু'শ টাকার একটা মনিঅর্ডার আসে। আমি সেটা পিয়ন দিয়ে জমিদারবাড়ী পাঠিয়ে দিই। পিয়ন সেদিন আমাকে এসে

বলে যে, জমিদার তেল মাখ্‌ছিলেন, তাঁর আদেশমত তাঁর একজন আত্মীয় জমিদারের নাম দস্তখত ক'রে টাকা নিয়েছে। এখন জমিদার এই ব'লে রিপোর্ট করেছেন যে, টাকা তিনি পাননি; যিনি টাকা পাঠিয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে তিনি জান্‌তে পেরেছেন যে তাঁর নাম জাল ক'রে কে টাকা নিয়েছে। এই ব্যাপার তদন্তের জন্য তিন দিন পরে পোষ্ট্যাল্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ আস্‌বেন। এখন আমার যে প্রধান সাক্ষী পিয়ন, জমিদারমশায় নিশ্চয় তাকে পয়সার পথ দেখিয়ে থাক্‌বেন। সে যে জমিদারবাড়ী গিয়ে টাকা দিয়ে এসেছে সে কথা সে আমারই কাছে অস্বীকার কর্‌ছে। কাজেকাজেই দাঁড়াচ্ছে যে আমি কাউকে দিয়ে সই করিয়ে টাকাটা নিয়েছি। এখন মনিঅর্ডারে যে দস্তখত করেছিল তাকে খুঁজে বার কর্‌তে না পার্‌লে আমার কি অবস্থা হবে বুঝ্‌তেই পাচ্ছেন!"

ক্রোধে এবং ঘৃণায় আমার মুখে বাক্য সরিতেছিল না। দেখিলাম মনোরমা আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আমার বক্তব্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাহার পিতার এই আসন্ন বিপদের মধ্যে তাহার লজ্জা বা সঙ্কোচ করিবার অবকাশ ছিল না। তাই আজ আমি আসাতেও সে এক পা না নড়িয়া যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি কহিলাম, "জমিদার ব'লে সে কি মনে ভেবেছে, যা ইচ্ছে তাই সে কর্‌তে পারে? আচ্ছা তা হ'লে একবার ভাল ক'রে দেখা যাক আমরাও তাকে বিপদে ফেল্‌তে পারি কি না!"

আমার কথা শুনিয়া পোষ্টমাষ্টার হাসিতে লাগিলেন; কহিলেন, "তা পারা যাবে না। মানুষকে পেষণ কর্‌বার সর্ব্বোত্তম অস্ত্র হচ্ছে টাকা, যেটা আমার হাতে নেই। তবে আপনার দ্বারা আমার এ বিপদে কতকটা সাহায্য পাওয়া সম্ভব বটে।"

আমি ব্যগ্রভাবে কহিলাম, "বলুন কি ক'রে। যদি অসম্ভব হয়, তা হ'লেও আমি প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ব।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "যদি কিছু মনে না করেন তা হ'লে বলি।"

আমি কহিলাম, "না বল্‌লেই মনে কর্‌ব যে, এখনও আমাকে পর মনে কচ্ছেন।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আমার মনে হয়, আপনি জমিদারের মেয়েকে বিবাহ কর্‌তে অমত জানিয়ে থাক্‌বেন, তাই আমার উপর এসব উৎপীড়ন আরম্ভ হয়েছে। আপনি যদি সেখানে বিয়ে কর্‌তে স্বীকৃত হন এবং যতদিন বিয়ে না হয় শুধু ততদিন যদি আমাদের সম্পর্ক ত্যাগ করেন, তা হ'লে বোধ হয় কোপটা অনেক কমে যায়। আপনাকে আমাদের নিতান্ত আত্মীয় ব'লে মনে করি ব'লেই এ কথা অকপটে বল্‌তে সাহস কর্‌লাম।"

পোষ্টমাষ্টার এ অনুরোধ করিবেন জানিলে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতাম না। কিন্তু তাঁহার অনুমানে কোন ভুল ছিল না;—প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে আমিই যে তাঁহার সমস্ত বিপদের মূলে ছিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু অপরকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য নিজকে এতটা বঞ্চিত করিবার মত শক্তি এবং আগ্রহ আমার ছিল না। আমি কহিলাম, "আপনাদের সম্পর্ক ত্যাগ কর্‌লে যদি আপনাদের সুবিধার কোন সম্ভাবনা থাকে, আমি এখনই তাতে রাজি আছি। কিন্তু জমিদারের মেয়েকে বিয়ে কর্‌ব না, তা আমি স্থির করেছি। সুতরাং সে প্রকারে আপনার উপকারে আস্‌তে পার্‌লাম না ব'লে আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ

করিয়ে নিয়ে নিজের সুবিধা ক'রে নেব, এতটা অবুঝ আমি নই। তবে এ কথাও আমি আপনাকে অকপটে জানাচ্ছি যে, আমি নিপীড়িত হচ্ছি ব'লেই যে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে তার কোন কারণ নেই। জমিদারবাড়ীতে বিয়ে করলেও আপনাকে এই গ্রামের মধ্যে আমাদের একমাত্র হিতৈষী বন্ধু ব'লে জানব।"

আমি কহিলাম, "আমি যে আপনাদের হিতৈষী, আপনাদের সঙ্গে জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই আমাকে তার পরিচয় দিতে দিন। জমিদারের মেয়েকে বিয়ে ক'রে আমি সে পরিচয় দিতে চাইনে! সেজন্য আপনাদের সঙ্গে আমি সমস্ত নির্যাতন সহ্য করতে প্রস্তুত আছি।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "শুধু আপনি হ'লে আমার কোন সঙ্কোচ থাকত না, কারণ আপনার পরিচয় প্রথম দিনেই পেয়েছি। কিন্তু ও বিষয়ে আপনাদের সমস্ত পরিবারের স্বার্থ জড়িত। আমি যদি কোনপ্রকারে আপনাদের সংসারের ক্ষতির কারণ হই, তা হ'লে আমি নিতান্তই দুঃখিত হ'ব। তা ছাড়া আমার নিজের স্বার্থও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। জমিদারের মেয়েকে আপনি বিয়ে করলে হয় ত আমাদের উপর জমিদারের আক্রোশ কমে যাবে। আমার জন্য আমি একটুও ভাবিনে। কষ্ট পাবার ভয়ে দুর্বৃত্তের কাছে নত হব এত দুর্ব্বল আমি নই। আমি ভাবি শুধু মনু-মা'র জন্যে। ধরুন আমার যদি জেল হয়, মনু কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে?"

চাহিয়া দেখিলাম মনোরমার চক্ষুদু'টি সজল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার সকরুণ মুখে একটা ভাষাহীন মর্ম্মান্তিক বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে! মনে হইল তাহার আকুল-দৃষ্টি যেন বাহুর মত আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে, "ওগো, আমাদের বাঁচাও, বাঁচাও! এ বিপদে তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু!"

সহানুভূতির তীব্র উত্তেজনা আমার মনকে যেন একটা নেশার মত চাপিয়া ধরিল। মাতালের মত লজ্জা, সঙ্কোচ, দ্বিধা কিছুই রহিল না। অসংলগ্ন ভাষায় অসম্বদ্ধভাবে কতকগুলা কি বকিয়া যখন চুপ করিলাম, দেখিলাম মনোরমার দুঃখ-পাংশু মুখখানি লজ্জায় গোলাপফুলের মত টক্‌টকে হইয়া উঠিয়াছে এবং পোষ্টমাষ্টার সকৃতজ্ঞ-আনন্দে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছেন, "তা হ'লে জেলে গেলেও আমার কোন দুঃখ থাকবে না!"

সেদিন গৃহে ফিরিতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। বাড়ী আসিয়া বিপিনকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম।

বিপিন সমস্ত শুনিয়া কহিল, "আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু আমার দ্বারা তুমি কি কাজ নেবে বল্‌ছ?"

আমি কহিলাম, "তুমি পিয়নকে ঠিক করবে। সে যাতে মিথ্যা কথা না বলে তার ব্যবস্থা করবে। এর জন্য যদি হাজার টাকা খরচ করতে হয় তাও করা যাবে! তাকে বলতে হবে, সে জমিদার-বাড়ী গিয়ে টাকা দিয়ে এসেছে, এবং যে সই ক'রে টাকা নিয়েছে তার নাম আমাদের ব'লে দেবে, কিংবা তাকে দেখিয়ে দেবে।"

বিপিন কহিল, "আচ্ছা সে চেষ্টা আমি সাধ্যমত করব। কিন্তু অত টাকা তুমি পাবে কোথায়?"

আমি কহিলাম, "সে টাকা পোষ্টমাষ্টার দেবেন। আমি তাঁকে বলেছি যে, যে টাকা পিয়নের জন্য খরচ করতে হবে, শুধু সেই টাকাটাই আমি বিবাহের যৌতুক ব'লে গ্রহণ করব।"

বিপিনের মুখে দুষ্টামির হাসি দেখা দিল। আমি কহিলাম, "হাস্‌ছ যে?"

বিপিন কহিল, "একটা গান মনে পড়েছে—'প্রেমের ফাঁদ পাতা

ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।' জমিদারবাড়ীতে ধরা না প'ড়ে পোষ্টাফিসে তুমি ধরা পড়্‌বে তা কে জান্‌ত বল? কিন্তু আমাদের যে দশ পনের হাজার টাকা লাভের পথ তুমি বন্ধ কর্‌লে সে ক্ষতি পূরণ কি রকম ক'রে কর্‌বে শুনি?"

আমি কহিলাম, "তোমাদের ইজ্জত নষ্ট না হ'তে দিয়ে।"

পরদিন প্রাতে পিতা আমাকে ডাকাইয়া কহিলেন, "আজ বৈকালে তুমি কোথাও বেরিয়ো না—জমিদারমশায় তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে আস্‌বেন।"

এতদিন পিতার সহিত প্রত্যক্ষভাবে ও বিষয়ে আমার কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু একদিন যে হইবে তাহা আমি জানিতাম এবং সেজন্য প্রস্তুতও ছিলাম। আমার যাহা বক্তব্য তাহা সংক্ষেপে এবং সবিনয়ে নিবেদন করিলাম। আমার নির্লজ্জতা শুধু পিতাকে নহে আমাকেও বিস্মিত করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতে গুরুজনকে যে ভক্তির দশগুণ ভয় করিয়া আসিয়াছে, সহসা তাহার পক্ষে এতটা স্বাধীন হইয়া উঠা কম বিস্ময়ের কথা নহে!

আমার কথা শুনিয়া পিতা ধীরভাবে কহিলেন, "তুমি ত বল্‌ছ জমিদার অত্যাচারী লোক, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত নয়। কিন্তু সেই অত্যাচারী লোক যদি হঠাৎ পোষ্টমাষ্টারকে ছেড়ে তোমার বাপের বিরুদ্ধে লাগে, তখন তুমি তোমার বাপকে জেলে যেতে দেখে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌বে ত?"

আমি কহিলাম, "অত্যাচারী লোক কখন্ অত্যাচার কর্‌বে সেই ভয়ে তাকে ঘৃণা না করা দুর্ব্বলতা।"

পিতা কহিলেন, "তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌বার প্রবৃত্তি আমার নেই। তোমাকে পাঁচ দিন সময় দিলাম। তুমি সমস্ত বিবেচনা ক'রে তোমার

মত আমাকে জানিয়ো। তারপর আমিও আমার কর্ত্তব্য ভেবে দেখ্‌ব। আজ আমি তাদের মানা ক'রে পাঠাচ্ছি।"

পিতার নিকট হইতে কতকটা সহজে পরিত্রাণ পাইলাম বটে, কিন্তু গৃহের অপরাপর আত্মীয়বর্গের অত্যাচারে অস্থির হইয়া উঠিলাম। রাজার চেয়ে পেয়াদার জুলুমটাই বেশী হয়—বিশেষতঃ যখন তাহা রাজ-ইঙ্গিতের অধীন হইয়া চলে। রোগের কঠিন অবস্থায় যেমন মুরগীর ঝোল হইতে আরম্ভ করিয়া চরণামৃত পর্য্যন্ত নির্ব্বিচারে একসঙ্গে চলিতে থাকে, তেমনি আমার উপর স্তুতি এবং নিন্দা, অনুরোধ এবং অনুযোগ যুগপৎ চলিতে লাগিল। কেহ রাজ্যের প্রলোভন দেখাইল, কেহ বা রাজকন্যার কথা বলিল। কেহ দেখাইল রাজা তুষ্ট হইলে কত সুবিধা হইবে, এবং কেহ বুঝাইল রাজা রুষ্ট হইলে ভয়ানক বিপদ। কিন্তু বিকার আমাকে এমনই প্রগাঢ়ভাবে পাইয়া বসিয়াছিল যে, কোন উপায়েই আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না।

পাঁচ দিনের মধ্যে যেদিন দুই দিন বাকি সেদিন দ্বিপ্রহরে ডাকঘরের একজন পিয়ন আমার নামে একটা চিঠি লইয়া আসিল। খুলিয়া দেখিলাম পোষ্টমাষ্টার লিখিয়াছেন, "আমার ভয়ানক বিপদ, দয়া করিয়া পত্রপাঠ একবার আসিবেন।"

ডাকঘরে যখন উপস্থিত হইলাম তখন পোষ্টমাষ্টার আফিসঘরে ব্যস্ত ছিলেন। আমি আসিয়াছি শুনিয়া তিনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন।

আমি কহিলাম, "কি হয়েছে?"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আজ সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ এসেছে। তার সঙ্গে দু'-তিনদিন ধরে বোঝাপড়া চল্‌বে। আমার ত এক মুহূর্ত্ত সময় নেই। এর মধ্যে বিপদের উপর বিপদ! কাল থেকে

মন্নুর খুব জ্বর হয়েছে। বুকে এত বেদনা যে, কথা কইতেও তার লাগ্‌ছে। আজ সকালে বেণীডাক্তারকে আন্‌তে পাঠিয়েছিলাম। তিনি ব’লে পাঠিয়েছিলেন যে, বাবুদের বাড়ী হ’য়ে বেলা ১১টার সময় আস্‌বেন। এখন একজন লোক ব’লে গেল যে, বেণী-ডাক্তার আস্‌তে পারবেন না। এ সবই জমিদারের কাণ্ড। সে-ই ডাক্তারকে আস্‌তে মানা ক’রে দিয়েছে। গ্রামে ত আর ডাক্তার নেই, তাই আপনাকে ডেকেছি। এ বিপদে একমাত্র আপনি সহায়। আমার বুদ্ধি লোপ পাবার মত হয়েছে। আপনি মন্নুর চিকিৎসা ও সেবা উভয়েরই ভার নিন।”

পোষ্টমাষ্টারের কণ্ঠের স্বর কাঁপিতেছিল এবং দেখিলাম তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজিকার এ নূতন বিপদে দেখিলাম তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া পাশের ঘরে মনোরমাকে দেখিতে গেলাম।

মনোরমা শয্যার পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। জ্বর পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার হাত ধরিতেই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, এবং একটু চমকিয়া আমাদেব দিকে ফিরিয়া চাহিল।

আমি কহিলাম, “কোন্‌খানে তোমার ব্যথা বোধ হচ্ছে ?”

মনোরমা হস্তের ইঙ্গিতে ডানদিকের বুক ও পিঠ দেখাইয়া দিল। পোষ্টমাষ্টারকে আফিস যাইতে বলিয়া ষ্টেথোস্কোপ আনিবার জন্য আমি গৃহে গেলাম। ষ্টেথোস্কোপ লইয়া আসিয়া মনোরমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, ডানদিকের বুক ও পিঠ নিউমোনিয়ায় গুরুতর-ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে এবং বামদিকেও রোগ সঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে পোষ্টমাষ্টারকে মনোরমার পীড়ার গুরুত্বের কথা জানাইলাম; এবং তাহার ফলে

যখন মনোরমার জীবনের পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর আসিয়া পড়িল তখন জীবন-পণ করিয়া মনোরমার সেবা ও চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলাম। প্রয়োজনীয় ঔষধাদির তালিকা করিয়া সেই দিনই বিপিনকে ঔষধ আনিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম।

বৈকালে মনোরমার জ্বর একটু কমিল। আমি মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটু ভাল বোধ কর্‌ছ কি?"

মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ভাল বোধ করিতেছে। তাহার পর সহসা আমার মুখের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল, "সায়েবের সঙ্গে বাবার কি কথা হ'ল?"

আমি কহিলাম, "সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই, সাহেব নিশ্চয়ই ভাল রিপোর্ট কর্‌বেন।"

কষ্টের মধ্যেও মনোরমার চক্ষু দু'টি দীপ্ত হইয়া উঠিল। ব্যগ্রভাবে কহিল, "কেমন ক'রে জান্‌লেন?"

মনোরমার এ প্রশ্নে আমি একটু বিপদে পড়িলাম; কারণ সাহেব যে ভাল রিপোর্ট করিবেন সে সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান ছিল না, শুধু মনোরমাকে একটু আশ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে ওরূপ কহিয়াছিলাম। আমি কহিলাম, "পিয়নকে সত্য কথা বল্‌তে রাজি করেছি। সে বল্‌বে যে, জমিদারের আদেশ মত জমিদারের একজন আত্মীয়কে টাকা দিয়ে এসেছিল। তা হ'লে আর তোমার বাবার কোন ভয় থাক্‌বে না।"

আমার কথা শুনিয়া মনোরমার চক্ষু দু'টি কৃতজ্ঞতায় সজল হইয়া উঠিল।

আমি কহিলাম, "মনোরমা, তোমার পুলটিস্‌ বদলে দেবার সময় হয়েচে।"

মনোরমা কহিল, "থাক, আর দিতে হবে না।"

"কেন ?"

মনোরমা ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আপনার হাতে অত গরম লাগে, ফোস্কা হ'তে পারে।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "সে জন্যে তোমার ভাবনা নেই, তুমি আগে ভাল হ'য়ে ওঠ, তার পর না হয় আমার ফোস্কার সেবা তুমিই করো।"

মনোরমার ক্লিষ্ট অধরে সলজ্জ হাসির রেখা স্ফুরিত হইয়া উঠিল। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া সে অন্যদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ চিকিৎসা এবং সেবা আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক কিংবা যে কারণেই হউক সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মনোরমা অপেক্ষাকৃত ভালই ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে জ্বর এবং অপরাপর উপসর্গ পুনরায় বৃদ্ধি পাইল। আমি ও পোষ্টমাষ্টার সমস্ত রাত্রি মনোরমার শিয়রে বসিয়া সেবা করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। পরদিন প্রাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, মনোরমার ফুস্‌ফুস্ পরিপূর্ণভাবে আক্রান্ত হইয়াছে।

আমার ডাক্তারী-জীবনের প্রথম রোগী মনোরমা। কলেজের দীন অভিজ্ঞতার ঊর্দ্ধে এক ইঞ্চিও উঠিতে পারি নাই—কিন্তু ভোরের আলোয় মনোরমার মুখ দেখিয়া মনে হইল সে আর বাঁচিবে না। তাহার সুনির্ম্মল মুখের উপর সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট এমন একটা ছায়া লক্ষ্য করিলাম যাহা দেখিয়া আমার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

আমার ডাক্তারী শিক্ষার সমস্ত শক্তি এবং জ্ঞান সঞ্চিত করিয়া প্রাণপণে আর একবার মনোরমার চিকিৎসায় লাগিলাম। যাহা কিছু

আমার জানা বা শুনা ছিল কিছুই বাকি রাখিলাম না। কিন্তু বৃথা! বৃথা! তখন ত আর ব্যাধির কোন কথা ছিল না, জগতের সমগ্র চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমবেত চেষ্টা যাহাকে প্রতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাহাই মনোরমার দেহের মধ্যে ধীর এবং অপ্রতিহতভাবে তখন প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দেশ ভাসাইয়া বন্যা ছুটিয়াছিল, তাহার সম্মুখে এক মুঠা মাটি ফেলিয়া কোন লাভ ছিল না।

দ্বিপ্রহর হইতে মনোরমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। মুখে তাহার আর কোন কথা রহিল না, শুধু প্রশান্ত দু'টি চক্ষুর সকরুণ দৃষ্টি প্রভাত আকাশের বিলীনোদ্যত তারকার মত আমাদের দিকে ক্ষীণভাবে সমস্ত দিন জাগিয়া রহিল! তাহার পর সন্ধ্যাকালে যখন একটির পর একটি করিয়া তারকা ফুটিয়া উঠিতেছিল তখন দেখিলাম, মনোরমার চক্ষু-তারকা সেই সময়েরই একটি কোন্ মুহূর্ত্তে সহসা স্থির অপলক হইয়া গিয়াছে!

* * * *

সে ঘটনার কথা অবগত হইয়া জমিদার মহাশয় এবং আমার পিতা বোধ হয় কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মনোরমার মৃত্যু দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে, আমি এখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। আমার এখনও মনে হয়—'এ জীবনে যাহা ঘটিল না তাহা—'।

প্রমাণ

১

তিনটি প্রাণী লইয়া সংসারটি কালস্রোতে সুখের তরণীর মত ভাসিয়া চলিতেছিল। স্বামী সুধাময়, স্ত্রী অরুণা এবং কন্যা করুণা। সুধাময়ের বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর, মার্চ্চেণ্ট্ আফিসে বড় চাকরি করে; শরীর একটু রুগ্ন এবং অলস, মনটি কিন্তু বিশেষভাবে প্রবণ এবং প্রবল, অর্থাৎ গিরিনদীর মত, অতি অল্প কারণেই বহিতে আরম্ভ করে এবং যখন বহিতে আরম্ভ করে তখন খরস্রোতে যুক্তি ও তর্ককে উপলখণ্ডের মত ভাসাইয়া লইয়া চলে। স্ত্রী অরুণার বয়স পঁচিশ বৎসর। গত পাঁচ বৎসর হইতে যাহারা তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহাদের মনে হয় সে যেন যৌবনের সর্ব্বাভ্যন্তরে উপনীত হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যেখান হইতে তাহার পতনের কোন লক্ষণ নাই। কেবলমাত্র একটি সন্তানের মাতৃত্বে অভিষিক্ত হইয়াই সে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। মনের তুষ্টি এবং দেহের স্বাস্থ্য উভয়ের সাহচর্য্যে তাহার নিটোল প্রসন্ন মূর্ত্তিখানি সুদক্ষ চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রের মত চিত্তাকর্ষক। কন্যা করুণা তাহার জননীর বাল্য মূর্ত্তিখানি সম্পূর্ণভাবে বহন করিয়া কৈশোরের সীমান্ত অতিক্রম করিবার উপক্রম করিতেছিল। সে তাহার জনক-জননীর একমাত্র সন্তান হইয়া তাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসার ষোল আনার অধিকারিণী, এই অভ্রান্ত জ্ঞানটির দ্বারা তাহার মনের মধ্যে একটি সুমিষ্ট অভিমান সঞ্চারিত হইয়াছিল।

সেদিন ছুটীর দিন ছিল। শীতের মধ্যাহ্নে আহারের পর শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত হইয়া সুধাময় ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল এবং অদূরে একটা বেতের চেয়ারের উপর বসিয়া অরুণা নিবিষ্টমনে একটা লেসের উপর রেসমের ফুল তুলিতেছিল। করুণা বাড়ী ছিল না; স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর গুরুতর অসুখ শুনিয়া দেখিতে গিয়াছিল।

সংবাদপত্রের একটা বিশেষ অংশ সুধাময়ের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। বড় বড় অক্ষরে হেড্-লাইন:—"আমেরিকা প্রত্যাগত জ্যোতিষী স্বামী বিমলানন্দ এম-এর অদ্ভুত কাহিনী"। তাহার নিম্নের মুদ্রিত বিবরণ পাঠ করিয়া সুধাময় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। উঃ কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! হিন্দুগণ যে জ্যোতিষশাস্ত্রকে অঙ্কশাস্ত্রের স্তরে লইয়া গিয়াছিল, এতদিনে এই মহাপুরুষ তাহা সপ্রমাণ করিলেন। যে সংশয়ী জাতি হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্রকে এতদিন 'বুজরুগী' বলিয়া পরিহাস করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই এখন তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে; বলিতেছে, এই মহাজ্ঞানীর নিকট অদৃষ্ট সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া ভূত এবং ভবিষ্যৎ ঠিক বর্ত্তমানের মতই প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! সুধাময় শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

স্বামীর ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিয়া অরুণা কহিল, "অত মন দিয়ে কি পড়্ছ?"

সুধাময় কহিল, "কলিকাতায় বিমলানন্দ স্বামী নামে একজন জ্যোতিষী এসেছেন। তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা! তিনি যা গণনা করেন তার একটিও ভুল হয় না। ইনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন—সেখানকার একজন পাদরি সাহেব বলেছেন যে, একজন পণ্ডিতের অঙ্ক কষায়

ভুল হ'তে পারে কিন্তু এঁর জ্যোতিষ গণনায় ভুল হবার যো নেই! তা ছাড়া আরও অনেক সাহেব এঁর গণনা দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছেন।"

অরুণা দন্তের সাহায্যে সূতা কাটিয়া বলিল, "কি দেখে গণনা করেন?"

"কোষ্ঠি দেখে, হাতের রেখা দেখে, কপালের রেখা দেখে, যেমন ক'রে বল্‌বে তেমনি ক'রে গণনা কর্‌বেন, অথচ গণনার ফল ঠিক এক হবে। আমেরিকার একজন লোকের কপালের রেখা দেখে ইনি গণনা করেন—তার পর দশ দিন পরে সেই লোকের মুখ ঢেকে হাতের রেখা দেখান হয়। তিনি হাতের রেখা দেখে যা গণনা করেছিলেন, তা আগেকার গণনার সঙ্গে একেবারে ঠিক মিলে গিয়েছিল।"

অরুণা আর কিছু না বলিয়া নিজের কার্য্যে মন নিবিষ্ট করিল।

সুধাময় কহিল, "গোটা কুড়িক টাকা দাও, আর বেরবার কাপড় দাও—এ সুযোগ ছাড়া হবে না।"

অরুণা কহিল, "স্বামীজির সঙ্গে দেখা কর্‌তে যেতে হবে না কি?"

"হ্যাঁ। আর চা'র দিন পরে তিনি জাপান রওয়ানা হবেন। হগ্‌ সাহেবের বাজারের দক্ষিণে তিনি আছেন। এগারটা থেকে আটটা পর্য্যন্ত লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন।"

"তা টাকা কি হবে?"

"আধ ঘণ্টা গণনা কর্‌বার জন্য তাঁর ফি দশ টাকা।"

অরুণা মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "যখনই শুনেছি আমেরিকার ফেরৎ, তখনই বুঝেছি যে পাকা ব্যবসাদার লোক। যে স্বামী ব'লে নিজেকে পরিচয় দেয়—তার এত টাকার প্রয়োজন কি? আধ ঘণ্টায় দশ টাকা?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুধাময় কহিল, "বল কি! যিনি এত

বড় একজন মহাত্মা ব্যক্তি, তাঁর কি কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই তুমি মনে কর? এ টাকা ইনি নিজের জন্য নিচ্ছেন না—এই টাকা নিয়ে ইনি কাশীতে হিন্দু কলেজ অব্ অ্যাষ্ট্রলজি খুল্‌বেন এবং এত বড় একটা মৃতপ্রায় শাস্ত্রকে জীবন দান কর্‌বেন।"

সুধাময়ের কথা শুনিয়া অরুণা শুধু একটু মৃদু হাস্য করিল—কিছু বলিল না। জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাহার স্বামীর অন্ধ বিশ্বাস এবং অনুরাগের কথা সে সম্পূর্ণ অবগত ছিল; প্রতিনিয়ত পুঁথি বগলে পথে পথে ঘুরিয়া ভাগ্য-নির্ণয় করিবার নামে যাহারা লোক ঠকাইয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি আছে বলিয়া যাহার দৃঢ় বিশ্বাস, আমেরিকা-প্রত্যাগত ইংরাজী সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত স্বামীজি সম্বন্ধে তাহার ধারণা টলাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তাহা অরুণা বিশেষরূপে জানিত।

সুধাময়কে টাকা দিবার সময় অরুণা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে শুনি?"

সুধাময় স্নেহভরে পত্নীর নাসিকায় অঙ্গুলির মৃদু আঘাত দিয়া কহিল, "জিজ্ঞাসা কর্‌ব কতদিনে তোমার একটি খোকা হবে।"

অরুণা কহিল, "সে খবরের জন্য আমি একটুও ব্যস্ত নই, ভগবানের কৃপায় আমার করুণ বেঁচে থাক্—তা হ'লেই হ'ল!"

"তবে কি জিজ্ঞাসা কর্‌ব?"

স্বামীর মুখের উপর প্রশান্ত দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সহাস্যমুখে অরুণা কহিল, "জিজ্ঞাসা করো, কবে তোমার পায়ে মাথা রেখে আমি মর্‌তে পাব।"

সুধাময় কহিল, "তার চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ব কতদিনে তোমার বৈধব্য-যোগ

ত্বরিতবেগে অরুণা সুধাময়ের মুখ চাপিয়া ধরিল; কহিল, "ফের যদি ওসব কথা বল্‌বে ত ভাল হবে না বল্‌ছি!"

হাসিতে হাসিতে সুধাময় প্রস্থান করিল।

২

প্রকাণ্ড অট্টালিকার নিম্নতলের দুইটি কক্ষ ভাড়া লইয়া বিমলানন্দ স্বামী দোকান সাজাইয়াছেন। সুধাময়কে অন্বেষণ করিতে হইল না। সুবিস্তৃত সাইনবোর্ডের উপর অতি বৃহৎ অক্ষরে ইংরাজীতে লেখা—"জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ স্বামী এম-এ"। এত বৃহৎ এবং উজ্জ্বল যে, কোন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বিফল হয় না। নামের উভয় পার্শ্বে রাশি-চক্র এবং গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত এবং দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সাইনবোর্ডে স্বামীজির জ্ঞান ও গরিমার কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত। দ্বারের নিকট তক্‌মা পরা ভৃত্য বসিয়া হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করিতেছে; ব্যবস্থা এমন সুন্দর যে, কেহ যে হ্যাণ্ডবিল না লইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে তাহার উপায় নাই। এমন কি সুধাময়কেও একটি হ্যাণ্ডবিল হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হইল।

প্রথম কামরাটি স্বামীজির আফিস। সেখানে নানাজাতির এবং নানাশ্রেণীর অভ্যাগতের দল বসিয়া আছে, পার্শ্বের ঘরে স্বামীজি বসিয়া গণনা করিতেছেন—যেমন যাহার ডাক পড়িতেছে সে যাইতেছে।

সুধাময় প্রবেশ করিতেই একটি কর্ম্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি গণনা করাবেন কি?"

"আজ্ঞে—হ্যাঁ।"

"কতক্ষণ সময় নেবেন ?"

"আধ ঘণ্টা।"

হস্ত প্রসারিত করিয়া কর্ম্মচারী কহিল, "দশ টাকা দিন্।"

সুধাময় ব্যাগ হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া প্রদান করিল।

কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম ?"

সুধাময় একটু ইতস্ততঃ করিয়া কি ভাবিয়া প্রকৃত নাম গোপন করিল; কহিল, "বিনোদবিহারী গুপ্ত।"

কর্ম্মচারী তখনই বিনোদবিহারী গুপ্তর নামে দশ টাকার একখানি রসিদ লিখিয়া সুধাময়কে দিল। সুধাময় পড়িয়া দেখিল, তাহার মধ্যে তাহার সময় নির্দ্ধারিত রহিয়াছে ৫৷৷টা হইতে ৬টা। তখন বেলা ২৷৷টা মাত্র।

সুধাময় কহিল, "আর একটু আগে আমার সময় দিতে পারেন না কি ?"

কর্ম্মচারী হাসিয়া কহিল, "আগেকার সমস্ত সময় বুক্ড্ (booked) হ'য়ে রয়েছে। কে নিজেকে অসুবিধায় ফেলে আপনাকে সময় দেবে বলুন ? আপনি ইচ্ছে কর্‌লে বাড়ী ঘুরে আস্‌তে পারেন কিংবা অন্য কোথাও যদি কাজ থাকে—"

সুধাময় কহিল, "না, তা হ'লে অপেক্ষাই করি।"

"যেমন আপনার সুবিধা" বলিয়া কর্ম্মচারী অন্যত্র চলিয়া গেল।

সুধাময় বসিয়া হ্যাণ্ডবিলখানি পড়িতে লাগিল। হ্যাণ্ডবিলটি স্বামীজির ক্ষমতা এবং কীর্ত্তি-কাহিনীর সম্পূর্ণ বিবরণী। খবরের কাগজে ইহার দশভাগের একভাগও প্রকাশিত হয় নাই। হ্যাণ্ডবিলখানি পাঠ করিতে করিতে বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে সুধাময়ের মন ভরিয়া উঠিল। আর

কিছুক্ষণ পরেই এই যাদুকরের মন্ত্রপ্রভাবে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের যবনিকাখানি উন্মোচিত হইয়া যাইবে এবং এতদিন ধরিয়া যাহাকে সে অদৃষ্ট মনে করিয়া নিগূঢ় রহস্যের মধ্যে নিহিত মনে করিত, তাহা তাহার চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠিবে।

স্বামীজির ঘরের মধ্যে বেল বাজিয়া উঠিল এবং তাহার পরেই একটি ইংরাজ-মহিলা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে একটি ইংরাজ অপেক্ষা করিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখ্‌লেন?"

ইংরাজ-রমণী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, "The most wonderful man! He works miracles!"

শুনিয়া সুধাময় মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তাহার পর দীর্ঘ অপেক্ষার পর যখন তাহার ডাক পড়িল, তখন মন্ত্রাভিভূতের মত সে স্বামীজির কক্ষে প্রবেশ করিল।

৩

একটি শ্বেত পাথরের টেবিলের সম্মুখে, চেয়ারের উপর বিমলানন্দ স্বামী বসিয়া আছেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ দেহ, চক্ষু দু'টি দীপ্ত প্রভায় জ্বলিতেছে এবং সমস্ত মুখের মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রতিভার চিহ্ন পরিস্ফুট। সুধাময়ের মনে হইল, গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির দ্বারা স্বামীজি যেন তাহার জীবনের সমস্ত অতীত এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা দেখিয়া লইতেছেন—যেন সে অতলস্পর্শী দৃষ্টি হইতে কোন-কিছু গোপন রাখিবার উপায় নাই। বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে সুধাময় স্বামীজিকে অভিবাদন করিতে ভুলিয়া গেল।

সুধাময়ের আপাদ-মস্তক গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিমলানন্দ কহিলেন, "নাম ভাঁড়াইয়াছ কেন? তোমার যা লক্ষণ এবং ইঙ্গিত,

তাতে তোমার নাম বিনোদবিহারী গুপ্ত হ'তেই পারে না। তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে এসেছ দেখ্‌চি। কিন্তু বাপু, তোমরা আধুনিক শিক্ষালাভ ক'রে, astrologyকে যে লোক ঠকাবার একটা উপায় ব'লে মনে কর সেটা একটা মস্ত ভুল! আর সমস্ত উপায়েই লোক ঠকান যায়, শুধু জ্যোতিষ গণনার দ্বারা যায় না। কারণ যে তোমার অতীত জীবনের ঘটনা বলার স্পর্দ্ধা কর্‌ছে, সে তোমাকে ঠকাচ্ছে কি ঠকাচ্ছে না, সে বিষয়ে তোমার কোন সংশয় থাক্‌বার কারণ থাকে না।"

সুধাময় অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আমার অপরাধ হয়েছে; আমাকে ক্ষমা করুন। আমার নাম সুধাময় বসু।" বিস্ময়ে ও ভক্তিতে সুধাময় বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল!

বিমলানন্দ মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি অপরাধ কর নি; যারা জ্যোতিষ গণনায় ভুল করে তারাই অপরাধী। তাদের দোষেই জ্যোতিষ শাস্ত্রে লোকের আস্থা নেই। বোস।"

স্বামীজির সম্মুখে চেয়ারের উপর সুধাময় বসিল।

"কোষ্ঠি দেখাবে, না হাতের রেখা দেখ্‌ব?"

সুধাময় কহিল, "আপনার যা ইচ্ছা, কোষ্ঠিও এনেছি।"

স্বামীজি কহিলেন, "হাতই দেখি—কোষ্ঠির গণনার ভুল হ'তে পারে, হাতের রেখা মিথ্যা কথা বলে না।"

সুধাময় হাত বাড়াইয়া দিল। স্বামীজি হাতের রেখা দেখিয়া কাগজে গণনা করিতে লাগিলেন। প্রথমে জন্মরাশি নক্ষত্র, তাহার পর জন্মবৎসর, জন্মদিন, সমস্ত গণনা করিলেন। তাহার পর জীবনের অতীত ঘটনা দুই একটি বলিতে লাগিলেন।

মুগ্ধ সুধাময় কহিল, "আপনি মহাত্মা; আপনার গণনার কোন ভুল হয় নাই।"

স্বামীজি কহিলেন, "তুমি বিবাহিত, তোমার স্ত্রী জীবিত, কিন্তু তুমি নিঃসন্তান। তোমার সন্তান হয় নাই, কখন হইবেও না।"

সুধাময় একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "একটু ভুল হচ্ছে।"

স্বামীজি পুনরায় গণনা করিয়া কহিলেন, "না ভুল হয় নি। তোমার স্ত্রী জীবিত। কিন্তু তুমি নিঃসন্তান।"

সুধাময় একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আজ্ঞে আমার একটি মেয়ে আছে।"

"জীবিত?"

"জীবিত।"

"প্রতারণা করো না।"

সুধাময় কহিল, "আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনার নিকট প্রতারণা করা বৃথা!"

বিমলানন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "কই দেখি তোমার কোষ্ঠি।"

সুধাময় পকেট হইতে কোষ্ঠি বাহির করিয়া দিল। বিমলানন্দ কোষ্ঠি লইয়া গণনা আরম্ভ করিলেন। বিস্তৃত সূক্ষ্মভাবে গণনা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ সময়ের পর কোষ্ঠির গণনা শেষ হইলে, সুধাময়ের ললাটের রেখা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাহার পর একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়া একটা খামে মুড়িয়া সুধাময়ের হস্তে দিয়া কহিলেন, "বাইরে গিয়ে পড়ো।" তাহার পর বেল বাজাইয়া দিলেন।

সুধাময় কহিল, "আমার একটা প্রশ্ন আছে।"

স্বামীজি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তা হ'লে কাল এস। আধঘণ্টার স্থলে তোমার প্রায় ৪০ মিনিট হ'য়ে গিয়েছে। আমার আপত্তি না থাকতে পারে, কিন্তু যাঁকে বসিয়ে রেখেছি তাঁর আপত্তি থাকতে পারে।"

সুধাময় কহিল, "দু'মিনিটের বেশী লাগ্‌বে না—"

কিন্তু ততক্ষণে কক্ষে আর এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। স্বামীজি সুধাময়ের কথার উত্তর না দিয়া তাহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

তখন অগত্যা স্বামীজিকে অভিবাদন করিয়া সুধাময় বাহিরে ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইল। খামখানা ছিঁড়িয়া কাগজ বাহির করিয়া গ্যাসের আলোকে পাঠ করিল। তাহাতে লেখা ছিল, "আমার গণনায় কোন ভুল নাই—তোমার ধারণায় ভুল।"

সেই খামের মধ্য হইতে কালসর্প বাহির হইয়া দংশন করিলেও বোধ হয় সুধাময় সেরূপ বিহ্বল হইত না। এই কয়েকটি অক্ষরের মধ্যে গুপ্তভাবে যে তীব্র বিষ সঞ্চিত ছিল, তাহার তাড়নায় সুধাময়ের সমস্ত দেহ ঝিম ঝিম করিয়া আসিল! গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক তাহার চক্ষে নিমেষের মধ্যে স্তিমিত হইয়া গেল এবং তাহার ভাবহীন অনুদ্দিষ্ট দৃষ্টির সমক্ষে রাজপথ এবং নিউমার্কেটের দৃশ্যাবলী স্বপ্নরাজ্যের অর্থবিহীন নিঃশব্দতায় কেবলমাত্র নড়িতে লাগিল! তাহাকে দেখিয়া সম্মুখস্থ ঠিকাগাড়ী হইতে দুইজন সহিস আসিয়া যখন "বাবু গাড়ী চাই, গাড়ী চাই" করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, তখন সুধাময়ের চেতনা অল্প ফিরিয়া আসিল এবং কিছু মনে মনে স্থির না করিয়াই সহসা পশ্চিমদিক লক্ষ্য করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পায়ে যেন কেহ দশ মণ পাথর বাঁধিয়া দিয়াছে, কোনমতেই পা চলিতে চাহে না!

চৌরঙ্গীরোড পার হইয়া, ট্রামের রাস্তা পার হইয়া, পুষ্করিণীর পাশ দিয়া, মাঠ ভাঙ্গিয়া সুধাময় পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিল। পথ আর শেষ হয় না। শীতকালের অন্ধকার রাত্রি, মাঠে লোকজনের ভিড়

নাই ; সেই নির্জ্জন মাঠ ভাঙ্গিয়া সুধাময় কোথায় চলিয়াছিল, তাহা সে নিজেই জানে না। তাহার মনের মধ্যে যে উদ্দাম ঝটিকা গর্জ্জন করিতেছিল, তাহার ভীষণতার মধ্যে তাহার সমস্ত অনুভূতি ডুবিয়া গিয়াছিল। অবশেষে দীর্ঘ সময় এবং দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া, মাতালের মত টলিতে টলিতে সে যখন গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটা জেটিতে একটি মাত্রও লোক ছিল না। সুধাময় তাহার উপর গিয়া বসিল। পায়ের নীচে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছিল, মাথার উপর আকাশে অসংখ্য তারকারাজি হাসিতেছিল এবং শীতের তীব্র উত্তরে-বাতাস সজোরে বহিতেছিল। সেইরূপ অবস্থায় বসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা সুধাময় কত কি ভাবিল, কিন্তু মনের অশান্তভাবের উপশম হইল না। বিমলানন্দ স্বামীর অভ্রান্ত জ্ঞান আজ তাহার সুখের মূলে যে নির্ম্মমভাবে দংশন করিয়াছে, তাহা হইতে আর কোন ক্রমে নিস্তার নাই! আমেরিকাবাসী পাদরির কথা সুধাময়ের মনে পড়িল,—"অঙ্ক কষায় ভুল হইতে পারে, কিন্তু বিমলানন্দের গণনায় ভুল হইতে পারে না!"

অধীর হৃদয়ে সুধাময় সেখান হইতে উঠিয়া ষ্ট্রাণ্ড্‌রোডে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা খালি গাড়ী যাইতেছিল দেখিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল।

সুধাময় গৃহে পৌঁছিলে অরুণা কহিল, "কি কাণ্ড বল দেখি? সেই দুপুরবেলা বেরিয়েছ, আর এই দুপুর রাতে ফির্‌লে! আমাদের মনে কি ভাবনা হয় না?"

সুধাময় অস্পষ্ট স্বরে বিড় বিড় করিয়া কি বলিয়া সরিয়া গেল। অরুণা পিছনে পিছনে গিয়া কহিল, "কি হয়েছে তোমার, মুখ অত ভার কেন? অসুখ করে নি ত?"

কথার উত্তর না দিয়া সুধাময় একটা ইজিচেয়ারে শয়ন করিল।

অরুণা কহিল, "গণক্‌কার গুণে বুঝি কোন মন্দ খবর দিয়েছে? তাই যদি দিয়ে থাকে তাতে মন খারাপ্ ক'রে কি হবে? ওদের সব কথাই মিথ্যা হয়।"

সুধাময় উচ্চকণ্ঠে কহিল, "যাও যাও! আমার সম্মুখ থেকে সরে যাও! বিরক্ত করো না!"

অরুণা এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে করুণা তাহার জননীর মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মুখ রক্তবর্ণ, চক্ষুদু'টা ফুলিয়াছে এবং সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা এবং অশান্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"কি হয়েছে মা তোমার?"

"কিছু হয় নি মা।"

"তবে জিনিস পত্তর গুছচ্চ কেন?"

অরুণার দুই চক্ষু হইতে রুদ্ধ-অশ্রু ঝর ঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল।

কাল রাত্রে যে ভীষণ অশ্রাব্য কথা শুনিয়া সে ভগবানের নিকট চির-বধিরতা প্রার্থনা করিয়াছিল, সেই শ্রবণ-পথে এই সুমধুর সহানুভূতির সুর প্রবেশ করিয়া অরুণাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

জননীর বেদনায় করুণার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল; কহিল, "মা তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? শীঘ্র বল কি হয়েছে।"

অরুণা অশ্রু মুছিয়া কহিল, "করুণ, আমি আজ এ বাড়ী ছেড়ে যাব। তুমি লক্ষ্মীমেয়ের মত তোমার বাবার খাওয়া পরা দেখো, সেবা যত্ন করো। আমি জিনিস পত্তর গুছিয়ে তোমাকে সব বুঝিয়ে

দেব, আর তোমাকে চাবি দিয়ে যাব। তুমি এবার থেকে সব দেখ্‌বে শুন্‌বে। বুঝ্‌লে ত?"

করুণা সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, "আমি সে সব কথা শুন্‌তে চাইনে, তুমি কেন যাচ্ছ বল।"

অরুণা কহিল, "ছেলেমানুষের সব কথা শুন্‌তে নেই। এইটুকু জেনে রাখ, এখানে কোন কারণে আমাব থাকা চল্‌বে না। তোর মা যদি আর না ফেরে, হ্যাঁ করুণ, তুইও কি তোর মাকে ভুলে যাবি?" অরুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

করুণা কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, "যাও, তুমি যদি ওসব কথা বল্‌বে ত আমি বাবার কাছে গিয়ে জেনে আস্‌ব কি হয়েছে"—বলিয়া করুণা তাহার পিতার উদ্দেশে চলিল।

অরুণা ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, "করুণ, ও করুণ! শুনে যাও।" কিন্তু করুণা ফিরিল না—চলিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে করুণা ফিরিয়া আসিল; চক্ষে অশ্রুজল, অভিমানে কণ্ঠ নিরুদ্ধ।

অরুণা তাহাকে সাদরে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "করুণ, কি হয়েছে মা?"

করুণা জননীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া ফুলিতে লাগিল। অরুণা তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর কিছু পরে মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, উচ্ছ্বসিত অশ্রুর প্রবাহে করুণার মুখখানি ভাসিয়া গিয়াছে।

"কি হয়েছে করুণ?"

করুণা কহিল, "মা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

"কেন মা?"

"বাবা আমার মুখ দেখ্‌বে না বলেছে।"

এত দুঃখেও, ঘৃণায় ও ক্রোধে অরুণার চক্ষু অগ্নিকণিকার মত জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, "যত দিন আমি না ফির্‌ব, ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে?"

"পার্‌ব।"

"আচ্ছা, তবে তুমিও চল। তবে মনে রেখো করুণ, দু'দিন পরে এখানে ফের্‌বার জন্যে অধীর হ'লে চল্‌বে না।"

করুণা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিল, "মা, তবে আমার জিনিস পত্তর গুছিয়ে নিই?"

অরুণা কহিল, "না না, সে হবে না। এখান থেকে কোন জিনিস নিয়ে যেতে পার্‌বে না। পড়েছ ত, পরের দ্রব্য নিলে চুরি করা হয়।"

বেলা যখন নয়টা, তখন অরুণা কন্যাকে লইয়া সুধাময়ের নিকট উপস্থিত হইল। সুধাময় ইজিচেয়ারে শয়ন করিয়া, মাথামুণ্ডু কত কি ভাবিতেছিল। সারা রাত্রির অনিদ্রা ও উত্তেজনায় তাহার মূর্ত্তি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল।

অরুণা ধীর অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "আমাদের গাড়ী এসেছে।" তাহার পর চাবির গুচ্ছ চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া কহিল, "এই চাবির রিং রইল—এতে সব চাবি আছে। গহনার বাক্স লোহার সিন্ধুকে রইল। আর আমার কাছে সংসার খরচের যে নগদ টাকা ছিল, সে টাকা ও হিসাব দেরাজের মধ্যে রেখেছি।"

তাহার পর একটু থামিয়া কহিল, "করুণের আর আমার সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের পাশ-বুক্‌ লোহার সিন্ধুকে রইল।"

তাহার পর স্বামীর প্রতি একবার গভীর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিপাত করিয়া, গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

করুণা ঘাড় বাঁকাইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে প্রণাম করিল না। অভিমানে তাহার মন আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

অরুণা কহিল, "এস করুণ, আর দেরী করা নয়।" শেষের কথা কয়েকটি বলিতে অরুণার কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। যে শক্তির বলে প্রাণপণে সে এতক্ষণ নিজকে সংবরণ করিয়া রাখিয়াছিল, সহসা তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

মাতা ও কন্যা উভয়ে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুধাময় কাঠের মত ইজিচেয়ারে নীরব নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশ হইতে দুইটি সামান্য কথা বারংবার উঠিতেছিল 'শুনে যাও'। কিন্তু যেন যাদুমন্ত্রবলে তাহার জিহ্বা অসাড় হইয়া গিয়াছিল। কোনরূপেই মুখ দিয়া বাহির হইল না। শুধু মনে হইল, কে যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে গলিত লৌহ ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। অব্যক্ত অসহ্য যন্ত্রণায় হতচেতনের মত সুধাময় পড়িয়া রহিল। তাহার পর কিছুক্ষণ পরে রাজপথে যখন গুম্‌গুম্‌ করিয়া গভীর মর্ম্মভেদী শব্দে একটা গাড়ী চলিয়া যাওয়ার শব্দ শুনা গেল, তখন সুধাময় দুই হস্তে সজোরে বুকের দুই দিক্‌ টিপিয়া ধরিল।

অরুণা প্রথমে বউবাজারে তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ী গিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দিনই তাহার পিতৃদত্ত একখানা অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, তাহার এক আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া রাত্রের গাড়ীতে তাহার ভ্রাতার নিকট লাহোর যাত্রা করিল।

৪

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন মনে করিল, সুধাময়ের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে, নহিলে সহসা স্ত্রী-কন্যা শ্যালকের নিকট পাঠাইয়া দিয়া

দিবারাত্র জ্যোতিষ-চর্চ্চা লইয়া সে উন্মত্ত হইবে কেন? শুধু আফিসের কাজটুকু ছাড়া আহার-নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিয়া সে অহর্নিশি জ্যোতিষের পিছনে লাগিয়াছে। ক্লান্তি নাই, আলস্য নাই, বিরক্তি নাই; দিবারাত্র সুধাময় বহুবিধ পুস্তকের মধ্যে নিজকে নিমজ্জিত করিয়া গণনা করিতেছে। বিলাত ও আমেরিকা হইতে এমন মেল আসিত না, যাহাতে তাহার পুস্তক না আসিত। এ সকল দেখিয়া লোকে মনে করিত সে নিশ্চয় পাগল হইবে। বিমলানন্দ স্বামী তাহার মনের মধ্যে যে কি আগুন জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহার সন্ধান ত কেহ জানিত না!

একটা কথা মনে করিয়া সুধাময় কিছুই স্থির করিতে পারিত না। বিমলানন্দের গণনায় ভুল হইতে পারে, এ কথা সেদিন তাহার মনে স্থান পায় নাই বটে, কিন্তু তথাপি অরুণার নিকট সুধাময় যে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহাতে অরুণা কোনমতেই স্বীকৃত হইল না কেন? সুধাময় যখন বিমলানন্দের গণনার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য বিমলানন্দেরই দ্বারা অরুণার হস্তরেখা গণনা করাইবার প্রস্তাব করে, তখন দৃপ্ততেজে জ্বলিয়া উঠিয়া অরুণা কহিয়াছিল, "আমাকে এত সামান্য মনে করো না যে, নিজকে এরূপ ঘৃণিতভাবে পরীক্ষায় ফেলে নিজের আত্মমর্য্যাদাকে অপমান করব। এর জন্য তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর, তাতেও আমি রাজি আছি!" অরুণা যে কেবল আত্মসম্ভ্রমেরই জ্ঞানে সে পরীক্ষায় সম্মত হয় নাই, সে কথা সুধাময় কল্পনা করিতে পারিত না।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে একবার সুধাময় তাহার শ্যালকের নামে কিছু টাকা পাঠাইয়াছিল। কুপনে সুধাময় লিখিয়াছিল 'কর্ত্তব্যের অনুরোধে মাসহারা'। কিন্তু সেই

মণিঅর্ডার যখন পৃষ্ঠে তীব্র বিদ্রূপ ও তিরস্কার বহন করিয়া ফেরৎ আসিল, তখন হইতে সুধাময় সম্পূর্ণভাবে নীরব হইয়া গিয়াছিল।

সেদিন আফিস হইতে আসিয়া সুধাময় দেখিল খামে মোড়া এক খানা চিঠি আসিয়াছে। ডাকমোহর লক্ষ্য করিয়া দেখিল লাহোরের ছাপ। একবার মনে হইল, চিঠি খানা না খুলিয়া মণিঅর্ডার ফেরতের পাল্টা জবাব দিলে হয়! কিন্তু কি ভাবিয়া খাম খানা ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। সুধাময় মনে যাহা অনুমান করিয়াছিল, চিঠি খুলিয়া দেখিল তাহা নহে। সে চিঠি করুণার, অরুণার বা তাহার শ্যালকের নহে; একজন ইংরাজ ডাক্তারের। নিম্নে নাম সাক্ষর রহিয়াছে—ই, এম, বেনেট্। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ।—

“আপনি বোধ হয় অবগত নহেন, আপনার কন্যা মিস্ করুণা সাংঘাতিকভাবে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। জীবনের আশা তাহার নাই বলিলেই চলে। তবে কোন অবস্থাতেই রোগীকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে বলিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি; আপনি পত্র পাঠ আমার লিখিত মত ব্যবস্থা করিবেন, বিলম্ব করিবেন না। আপনার কন্যার যে বিশেষ কারণে এবং বিশেষ প্রকারের ক্ষয়রোগ হইয়াছে বলিয়া আমি সন্দেহ করিতেছি, তাহা কদাচিৎ কাহারও হইতে শুনা যায়। যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। কোন ডাক্তারী বহিতে আমি ইহার উল্লেখ দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে। আমার সন্দেহ হওয়ায় মিস্ করুণাকে রণ্ট্জেন-রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তাহার শরীরের কোন একটা বিশেষ স্থলে একটা বিকৃতি আছে। সেই বিকৃতিই তাহার এই ক্ষয়রোগের মূল। এখন এই রোগের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এ রোগ যেমন কদাচিৎ হইতে দেখা যায়, তেমনি বংশানুগতভাবে

ভিন্ন অন্যপ্রকারে প্রায় হয় না; অর্থাৎ যাহার এই রোগ হইবে, বুঝিতে হইবে, তাহার পিতার অথবা মাতার কাহারও এই রোগ নিশ্চয় ছিল। আপনার পত্নীকে রন্ট্‌জেন-রে দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার কোন লক্ষণ নাই। আমার অনুমান সত্য হইলে আপনার শরীরে অল্পই হউক বা অধিকই হউক একটা নিদর্শন পাওয়া যাইবে। সেরূপ কিছু পাওয়া গেলে রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। বুঝিব, আপনার নিকট হইতেই আপনার কন্যা এই বিকৃতি লইয়া জন্মিয়াছিল, তাহার পর মানসিক কষ্ট বা শারীরিক অসুস্থতা এমনই কোন কারণের জন্য সেই বিকৃতি সহসা বাড়িয়া উঠিয়া আপনার কন্যার স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছে; এবং তদনুযায়ী চিকিৎসা করিব। এই পত্রের সহিত ডাক্তারের অবগতির জন্য একটা নোট লিখিয়া পাঠাইলাম। আপনি অবিলম্বে মেডিক্যাল কলেজের কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা আপনার দেহ পরীক্ষা করাইয়া আমাকে ফলাফল জানাইবেন; বিলম্ব করিবেন না, মনে রাখিবেন আপনার কন্যার পক্ষে এখন একদিন এক বর্ষের অনুরূপ।"

পত্র পাঠ করিয়া সুধাময় কিছুক্ষণ দুই বাহুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। এই মর্ম্মান্তিক ঘটনার মধ্য হইতে যে নিদারুণ সত্য নিজকে প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহা যদি ঘটিয়া যায় তাহা হইলে? তাহা হইলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত বহিতে আগুন লাগাইয়া নিজকে পুড়াইয়া মরিলেও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে না! সুধাময় তখনই ডাক্তারের পত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মেডিক্যাল কলেজের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরদিন প্রাতে তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতে ডাক্তার সুধাময়ের হস্তে পরীক্ষার রিপোর্ট দিয়া

কহিলেন, "না, আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনার নিকট হইতেই আপনার কন্যা এ রোগ সঞ্চয় করেছে।"

শুনিয়া সুধাময়ের হৃদয় নিস্পন্দ হইয়া আসিল। সে অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি হঠাৎ কোন গুরুতর মনঃকষ্ট পাই, আমার রোগও সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যেতে পারে নাকি?"

ডাক্তার সুধাময়কে দুর্ব্বলচিত্ত মনে করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "না, আপনি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকিবেন।"

ডাক্তার রণ্ট্‌জেন-রের দ্বারা সুধাময়ের ব্যাধিরই সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই ব্যাধির আরও নিম্নস্তরে যে গভীর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা নিহিত ছিল তাহার সন্ধান পান নাই!

এক বৎসর পূর্ব্বে নিউমার্কেটের সম্মুখে সন্ধ্যার সময় গ্যাসের আলোক সুধাময়ের চক্ষে ততটা নিষ্প্রভ মনে হয় নাই, যতটা আজ মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইয়া দিবালোককে সে স্তিমিত দেখিল!

এই এক বৎসর কি অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়া সে কাটাইয়াছে! নিরানন্দ, স্নেহহীন, প্রেমহীন জীবন মহাপাপের নির্ম্মম প্রায়শ্চিত্ত প্রতিনিয়ত ধীরে ধীরে করিয়া লইতেছিল; আজ সহসা নিদারুণভাবে সেই প্রায়শ্চিত্ত উদ্‌যাপনের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে! যাহা অসত্য, যাহা অসম্ভব, যাহা অস্বাভাবিক তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সুধাময় যাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল, এইরূপ মর্ম্মান্তিক উপায়ে সে প্রমাণ করিতে বসিয়াছে যে, সে সুধাময়ের পর নহে, সে তাহার নিতান্ত আপনার, সে তাহারই বক্ষের রক্তমাংসে গঠিত! শুধু তাহাই নহে, একই ব্যাধির ছাপে সেই রক্তমাংস চিহ্নিত!

সেই দিনই আফিসে ছুটী লইয়া রাত্রের ট্রেনে সুধাময় লাহোর যাত্রা করিল।

কিন্তু তিন দিনের দীর্ঘ পথ কষ্টে এবং উদ্বেগে অতিক্রম করিয়া সুধাময় যখন করুণার রোগ-শয্যা-পার্শ্বে উপনীত হইল, তখন করুণার অভিমানক্লিষ্ট জীবনের দুঃখভোগের আর বেশী বাকী ছিল না। সকল ব্যাধিকে যাহা নিরাময় করে, সকল যন্ত্রণার যাহাতে অবসান হয়, সেই মৃত্যুর মধুর আবেশে করুণা তখন জীবন-পারের স্বপ্ন দেখিতেছিল !

সুধাময়কে দেখিয়া তাহার মুখে মৃদু হাসি এবং চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। তাহাতে যে কতখানি অভিমান মিশাইয়া ছিল তাহা সুধাময় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল !

তাহার পর ?—তাহার পর দুই ঘণ্টা পরে যখন করুণার ক্লান্ত নয়নদু'টি সুগভীর নিদ্রাভরে ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া গেল, তখন অব্যক্ত অদ্ভুত বেদনায় সুধাময় ও অরুণা সেই নীরব নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহকে জড়াইয়া ধরিয়া পরস্পর মিলিত হইল।

লক্ষ্মীলাভ

১

পঁচিশ বৎসর বয়সে প্রথম মুন্সেফ্ হইয়াছিলাম। তাহার পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া শরীরের রক্ত এবং মাংস ক্ষয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়া আসিয়াছি। ঠিক বানপ্রস্থে যাইবার সময় হুগলীতে বদলি হইলাম। বন গমন করিলে বিশেষ যে ক্ষতি ছিল তাহা নহে, কারণ প্রথমতঃ, গৃহিণীকে লইয়া চিন্তিত হইবার কোন কারণ ছিল না। আমার হঠাৎ মৃত্যু ঘটিলে তাঁহাকে যাহাতে বৈধব্য ভোগ করিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বেই তিনি করিয়া গিয়াছেন এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনটি কন্যাই নিজ নিজ সংসার পাতিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বেই তাহাদের পিতাকে পেন্সন দিয়া বসিয়াছে! তথাপি বল্কল কমণ্ডলুর সন্ধান না করিয়া হুগলীতেই আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

যাঁহার নিকট হইতে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলাম তাঁহার পরিত্যক্ত বাসভবনটি ভাড়া লইলাম। এই গৃহটি হুগলীর সব-জজগণের প্রা মৌরসী সম্পত্তির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পরম্পরাক্রমে যে আসে সেই ভোগ দখল করে; তাহার পর বিদায়ের সময় আফিসের কাগজ-পত্রে সহিত উত্তরাধিকারীকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়।

বাড়ীখানি পথের ধারে। নির্জ্জনতা এবং নিষ্কর্ম্মতা যখন দুষ্ট বায়ু মত হৃদয়কে চাপিয়া ধরিত, তখন পথ-পার্শ্ববর্ত্তী বারাণ্ডায় দাঁড়াই পথের লোক-চলাচল দেখিতাম। পথে যে খুব বেশী লোক চলিত, তা নহে, কিন্তু যাহারা চলিত, তাহাদিগকে দেখিয়াই মনে মনে যথে

কৌতুক অনুভব করিতাম। পথের লোক আপন মনে পথ দিয়া যাতায়াত করে, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ ভাব এবং ভঙ্গী, তাহাদের চপলতা, গাম্ভীর্য্য এবং আত্মনিবিষ্টতা বারাণ্ডার উপর হইতে একান্তমনে যে পর্য্যবেক্ষণ করে, সে যে অন্তরের মধ্যে বেশ একটু কৌতুকের আস্বাদন পায় তাহা আমি হলফ্ করিয়া বলিতে পারি।

ইহা ত গেল কৌতুকের কথা। বারাণ্ডার উপর হইতে আর একটি দৃশ্য যাহা দেখিতাম, তাহাতে চিত্ত এবং চক্ষু উভয়ই এককালে পরিতৃপ্ত হইত। আমার গৃহের সম্মুখে পথের অপর পার্শ্বে একটি দরিদ্র প্রবীণ ভদ্রলোকের গৃহ। শুনা যায় পূর্ব্বে ইহাদের এমন অবস্থা ছিল যে, শুনিলে কাহারও সহজে সে কথা আজ বিশ্বাস হইবে না। চঞ্চলা লক্ষ্মী অচঞ্চল-ভাবে ইহাদের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় ভায়ের সহিত ভায়ের বিবাদ বাধিয়া উঠিল। লক্ষ্মী যখন দেখিলেন তাঁহাকে বিভক্ত করিবার জন্য দুই ভায়ই অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছে, তখন তিনি আত্ম-রক্ষার্থ আপনি বিভক্ত হইয়া হুগলীর দুই উকিলের গৃহে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর হইতে লক্ষ্মীর প্রত্যাবর্ত্তনের আর কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই। শুধু এই গৃহস্থের একটি অবিবাহিতা কন্যাকে দেখিয়া আমার মনে হইত লক্ষ্মী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবার ইহাঁদের গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন!

২

প্রত্যূষে যখন এই বালিকাটি তাহাদের পুষ্পোদ্যানে সাজি-হস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইত, আমি সহস্র প্রয়োজনীয় কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া সে দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতাম। প্রভাতসূর্য্যের রক্তাভ-রশ্মি-পাতে বালিকার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত এবং মল্লিকা-বেলার শুভ্র-সুগন্ধ-

স্তূপে সাজি দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠিত। ফুলগুলি প্রভাত-বায়ুতে হেলিয়া দুলিয়া যেন বালিকাকে সাদরে আহ্বান করিত এবং বালিকার সুকোমল অঙ্গুলি দ্বারা উন্মোচিত হইয়া তাহাদের পুষ্পজন্ম যেন সার্থকতা লাভ করিত। প্রত্যূষে এই পবিত্র চিত্র নিরীক্ষণ করিয়া আমার অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ হইয়া যাইত।

আমি ভাবিতাম এই পুষ্পলতিকাটিকে আমার গৃহ-প্রাঙ্গণে রোপণ করিয়া জলসিঞ্চন করিলে কেমন হয়। এই স্নেহশীলতার উৎস, এই করুণা-কোমলতার নির্ঝর আমার দাহ এবং শুষ্কতাকে কিয়ৎ পরিমাণে যদি সরস করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বানপ্রস্থের প্রস্তাব একেবারে পরিত্যাগ করিলেও চলিতে পারে। তিন বৎসর পাচক ভৃত্য লইয়া গৃহবাস করিয়া গৃহবাসকে বনবাসের অপেক্ষা যে বিশেষ মনোরম বোধ হইত তাহা নহে, অধিকন্তু বন গমন করিলে একটা মহা লাভ এই হইত যে, পয়সা দিয়া তৈল খরিদ করিয়া রাত জাগিয়া রায় লিখিতে হইত না।

প্রত্যহ বালিকাটিকে দেখিতাম এবং প্রত্যহই এই সকল কথা ভাবিতাম। অবশেষে রীতিমত প্রলুব্ধ হইয়া উঠিলাম।

৩

সে দিন ছুটির দিন ছিল। সকাল হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, অপরাহ্লের দিকে বৃষ্টিটা বেশ চাপিয়া আসিয়াছিল। রায় লেখা শেষ করিয়া জানালার ধারে বসিয়া বৃষ্টি দেখিতেছিলাম। এমন সময় ছিন্ন ছত্র মাথায় দিয়া কর্দ্দমাক্ত জুতা-হস্তে হরি ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি একজন ঘটক। হুগলীতে আসিয়া পর্য্যন্ত এখনও কাহারও সহিত আমার তেমন আলাপ হয় নাই, কিন্তু ইঁহার সহিত প্রায় ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে বলা যাইতে পারে; তাহার কারণ, আমি যতটা

অনুমান করিতে সক্ষম হইয়াছি, ইঁহার মনের মধ্যে এমন একটা কিছু ধারণা হইয়াছিল যে, আমার একটা কোন বিশেষ রকম উপকার ইঁহার দ্বারা হইতে পারে, কিংবা আমার দ্বারাই ইঁহার একটা বিশেষ রকম অর্থাগমের উপায় হওয়া অসম্ভব নয়।

দুই চারিটা অবান্তর কথার পর ঘটকমহাশয় বলিলেন, "বাবুর বয়সে ইংরেজরা ত অনেক সময় প্রথম বিবাহ করে।"

আমি কহিলাম, "তা ত করেই।"

"তবে এত দিন বিবাহ করেন নি কেন ?"

মনে মনে কহিলাম, তা হ'লে তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবার সুবিধা হ'ত না ব'লেই বোধ হয়। প্রকাশ্যে কহিলাম, "বিয়ে ত আর জান্‌আলী আর্‌দালীর সহিত কর্‌তে পারিনে—পাত্রী পাওয়া চাই ত!"

ঘটকের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; নাসিকায় সশব্দে নস্য ভরিয়া লইয়া কহিল, "ক'টা চান ? বাঙ্গলা দেশে আবার পাত্রীর অভাব! আপনি ত আপনি, সে বার মধুঘোষের বিয়ে দিয়ে দিলাম এক পরমা সুন্দরী কন্যার সঙ্গে। মধুঘোষের ষাটের ওপর বয়স, একটা চোখ কানা, একটা পা বেঁকা, তার ওপর কেশো রুগী। মর্‌বার এক মাস আগে বিয়ে দিয়ে দিলাম। বাবু, পয়সা হ'লে বাঘের দুধ মেলে—তা বিয়ের পাত্রী! আপনি এতদিন আমাকে বলেন নি কেন ?"

আমি কহিলাম, "ঐ টুকুই আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া আপনার এত দক্ষতার পরিচয় আমার জানা ছিল না।"

শুধু হরি ভট্টাচার্য্যকে দোষ দিলে অন্যায় হইবে। এই তিন বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ত্রিশ জন ঘটকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিবার আমার অবকাশ ঘটিয়াছে। যুবকদের অপেক্ষা প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধগণের

পক্ষে বিবাহ অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যাপার, এ কথা প্রত্যেকেই আমাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে।

হরিঘটক কহিল, "কি জানেন বাবু, অবিবাহিত থাকাটা কিছু নয়—কারণ শাস্তর বলছেন 'গৃহিণী গৃহমুচ্যস্তে' অর্থাৎ কি না গৃহিণী না থাকলে মহা বিপদ—"

অগত্যা আমাকে হাসিতে হইল—কহিলাম, "ঘটকমহাশয়, শাস্ত্রের বচন অকাট্য! গৃহিণী না থাকলে মহা বিপদ, সে কথা উপস্থিত ত আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি!"

একটা কথা মনে হইল। কহিলাম, "শুনুন ঘটকমহাশয়, আমার বাটীর সামনে হরিহরবাবুর একটি অতি সুন্দরী কন্যা আছে। আপনি একবার সন্ধান নিতে পারেন?"

ঘটক উৎফুল্ল হইয়া ছাতি খুলিয়া ফেলিল, কহিল, "এখনই! আমি চললাম—সন্ধ্যার পূর্ব্বে এসে সংবাদ দিয়ে যাব।"

আমি কহিলাম, "দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার কথা শুনে যান!"

ছাতির উপর বৃষ্টি চড়বড় করিয়া পড়িতেছিল, ঘটক ঈষৎ হাস্তের সহিত কহিল, "আমি সব জানি; শোনবার দরকার নেই—আপনি ভরদ্বাজ গোত্র, ফুলের মুকুটি, শ্রীধর ঠাকুরের সন্তান, আট শ' টাকা মাহিনা পান—"

"শুনুন ঘটকমহাশয়, শুনুন!"

বৃষ্টি এত জোরে পড়িতেছিল যে, ঘটক আমার কথা শুনিতে পাইল না—কিংবা শোনা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিল।

৪

দুই দিন ঘটকের সন্ধান পাইলাম না। তৃতীয় দিন বৈকালে বারাণ্ডায় বসিয়া আছি, ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইল। দন্ত বিকাশ করিয়া কহিল, "রাজি হয়েছে। সংবাদ শুভ—"

আমি কহিলাম, "কি রকম ?"

"সে অনেক কথা, প্রথমে কিছুতেই মত হয় না, মেয়ের মা ত কেঁদেই সারা—হাজার হোক্, বয়স্থ পাত্র সহজে কে চায় বলুন ? কিন্তু আমি কি তেমন কাঁচা লোক—একেবারে গোড়া বেঁধে ফেল্‌লাম—হরিহরবাবুকে হাত কর্‌লাম—বল্‌লাম, মেয়ে ত ধাড়ি হয়ে উঠেছে, শেষকালে কি মেয়েমানুষের বুদ্ধি শুনে জাত খোয়াবেন ? তা ছাড়া আপনার অনেক জন্মের পুণ্য যে, আপনার মেয়ে হাকিম-গিন্নী হবে। আট শ' টাকা মাইনে কি সহজ কথা, মশায়! হরিহরবাবু সমস্ত ঠিক ক'রে ফেলেছেন, মেয়েরাও নিম্‌রাজি হয়েছে। পাত্রী আমি সাজিয়ে রেখে এসেছি, আপনি একবার দেখ্‌বেন চলুন ; এই যে হরিহরবাবু আপনাকে আহ্বান কর্‌তে আস্‌ছেন !"

হরিহরবাবু আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য, মহাশয়, একবার অনুগ্রহ ক'রে যদি আমার বাড়ী—"

আমি ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "বলেন কি, বলেন কি—চলুন, এখনই যাচ্ছি।"

আমরা গিয়া হরিহরবাবুর বৈঠকখানায় বসিলাম। একজন দাসী বালিকাটিকে লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিল। লজ্জা ও সম্ভ্রমে সঙ্কুচিতা লতার ন্যায় জড়সড় হইয়া বালিকা আমার সম্মুখে উপবেশন করিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, গৃহে লক্ষ্মীপ্রতিষ্ঠা যদি করিতে হয় তাহা হইলে এমন সুযোগ লাভ করা পুণ্যের কথা !

আমি কহিলাম, "তোমার নাম কি ?"

বালিকা ধীরস্বরে কহিল, "শান্তিলতা।"

আমি কহিলাম, "মা, তোমার এই নাচার ছেলেটির ভার নিয়ে তাকে মানুষ কর্‌তে পার্‌বে ত ?"

আমার কথা শুনিয়া হরিহরবাবু বিস্মিতভাবে আমার দিকে চাহিলেন।

আমি কহিলাম, "শুনুন হরিহরবাবু, আমার একটি পুত্র আছে, তার নাম সুকুমার, কলিকাতায় সে বি-এল পড়্‌চে, বাপের মুখে তার সুখ্যাতি শুনে কাজ নাই—আবশ্যক বোধ কর্‌লে আপনি সে বিষয়ে সন্ধান নিতে পারেন। তবে এ পর্য্যন্ত আপনাকে বল্‌তে পারি, আপনার কন্যার অযোগ্য সে হবে না। এখন যদি আপনাদের অমত না হয়, তা হ'লে আমার গৃহে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা কর্‌বার ব্যবস্থা করি।"

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে হরিহরবাবু কহিলেন, "আপনার দয়া—সে আপনার দয়া—"

গৃহাভ্যন্তরে একটা কি গোলযোগ শুনা গেল। হরিহরবাবু দেখিয়া আসিয়া কহিলেন, "আপনার অনুগ্রহের কথা শুনে আনন্দের আতিশয্যে আমার স্ত্রীর ফিট্ হয়েছে; তাই উপস্থিত তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা আপনাকে জানাতে পার্‌লাম না।"

আমি কহিলাম, "সে কথা আমাকে না জানালে চল্‌বে—কিন্তু তাঁর নিকট হ'তে যে রত্ন আমি লাভ কর্‌চি তার জন্যে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা তিনি সুস্থ হ'লেই তাঁকে জানাবেন।"

সুকুমারের বিবাহের পরদিন হরি ভট্টাচার্য্যকে ভাল করিয়াই ঘটক-বিদায় করিলাম। প্রসন্নমুখে রজতচক্রগুলি ট্যাঁকে গুঁজিতে

গুঁজিতে ঘটক কহিল, "এইবার সুবিধা মত বাবুর জন্যে একটি পাত্রী সন্ধান করি।"

আমি কহিলাম, "ঘটকমহাশয়, এ জন্মে পরামর্শ হয়ে রইল; পরজন্মে আমার ঘটকালি কর্‌বেন। এ জন্মে ত আমার কথা শোন্‌বার কোন দরকার বোধ করেন নি—আর জন্মে অনুগ্রহ ক'রে আমার কথাটা ভাল ক'রে শুনে তার পর ঘটকালি কর্‌তে বেরুবেন।"

কিন্তু আমার ধারণা, এ জন্মের জন্যও আমার প্রতি হরিঘটকের যথেষ্টই লক্ষ্য আছে।

ক্রয়-বিক্রয়

গলির ভিতর একটি ভগ্নপ্রায় গৃহে পিতা ও কন্যা বাস করিত। বৃদ্ধ হরিচরণ মাসান্তে পঁচিশটি করিয়া টাকা পেন্সন পাইতেন, তাহাতেই কোনপ্রকারে সংসার চলিত। সংসার চালাইবার ভার ছিল কন্যা সুরমার উপর। এই পঁচিশ টাকা হইতে কেমন করিয়া যে হরিচরণের আহার-পাত্রে মাছের মুড়া এবং চিনিপাতা দধির একদিনের জন্যও অভাব ঘটিত না, হরিচরণের নিকট তাহা ইন্দ্রজালের ন্যায়ই বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হইত।

"গরীবের পাতে এত আয়োজনের দরকার কি, মা ?"

সুরমা স্নেহবিজড়িত-কণ্ঠে উত্তর দিত, "গরীব কেন, বাবা ? আমাদের ত কোন জিনিষেরই অভাব নেই !"

মাছের মুড়া আয়ত্ত করিতে করিতে হরিচরণের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। এই কন্যাটি ভিন্ন সংসারে তাঁহার আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। কিন্তু তাহাতে কি ? এই কন্যাটিই সকল অভাব পূর্ণ করিয়া হরিচরণের পক্ষে সর্ব্বময়ী হইয়া উঠিয়াছিল ! সুরমার সেবা-নিরত মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার স্নেহময়ী জননীর মূর্ত্তি হরিচরণের মনে পড়িয়া যাইত ! সুরমার স্নিগ্ধ-শুভ্র সৌন্দর্য্যের মাঝে হরিচরণ তাঁহার স্বর্গগতা পত্নীর ছায়া জাগরূক দেখিতেন।

সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ঘরে যে বয়সে কন্যার বিবাহ হইয়া যায়, সুরমা সে বয়স অতিক্রম করিয়াছিল ; কিন্তু তাহার বিবাহের জন্য হরিচরণের যথেষ্ট ব্যগ্রতা দেখা যাইত না। সুরমার বিবাহ হইলে

সুরমার অভাবে তাঁহার অশক্ত জীবন একেবারে অচল হইয়া পড়িবে, শুধু যে সেই আশঙ্কাতেই হরিচরণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন তাহা নহে; তাঁহার মনের মধ্যে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, যতদিন উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া যায় ততদিন কোনমতেই সুরমার বিবাহ দেওয়া হইবে না। পাত্রের উপযুক্ততা সম্বন্ধে হরিচরণের যে ঠিক একটা কঠিন এবং নির্দ্দিষ্ট ধারণা ছিল তাহা নহে, অর্থাৎ উপযুক্ত পাত্রের যে একটা কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ এবং অর্থ থাকিতেই হইবে এমন নহে; কিন্তু নামঞ্জুরের তালিকা সম্বন্ধে হরিচরণ অপেক্ষাকৃত নির্দ্দিষ্ট ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন, এবং সেই তালিকার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, সুধীরচন্দ্র, পল্লীর এক ধনবান্ চরিত্রহীন যুবক।

গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া পিতার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় সুরমা যখন মাঝে মাঝে রাস্তার ধারের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইত, তখন পথের জনতার মধ্য হইতে বহু সৎ এবং অসৎ পাত্র সুরমার সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ বিকাশটুকু নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সৎ পাত্রের দল এমনই সতর্ক যে, তাহারা আকৃষ্ট হইলেও ধরা দেয় না, দূর হইতে নিজেদের মহার্ঘতাকে সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলে। চরিত্রহীন সুধীরচন্দ্রের পক্ষ হইতে কিন্তু সেরূপ কোন আচরণ দেখা গেল না। তাহার তরফ্ হইতে হরিচরণের নিকট একদিন আবেদন আসিয়া উপস্থিত হইল।

শীতকালের সকালে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া বসিয়া হরিচরণ জমাখরচের হিসাব দেখিতেছিলেন, এমন সময় সুধীরচন্দ্রের এক গোমস্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবুদের গোমস্তাকে দেখিয়া হরিচরণ শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।—"আস্‌তে আজ্ঞা হয়, বসুন বসুন। অ ঝি, ভাল ক'রে এক কল্কে তামাক দিয়ে যাও।"

ঝি তামাক দিয়া গেল। তামাক নিঃশেষ করিতে করিতে অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে তীক্ষ্ণ গুম্ফের মধ্যে কঠোর হাস্যের রেখা টানিয়া গোমস্তা জানাইল যে, সে দিন হরিচরণের পক্ষে বাস্তবিকই সুপ্রভাত,—স্ত্রী-বিয়োগের পর সম্প্রতি বাবু দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার মানস করিয়াছেন; ঠিক বলা যায় না কি কারণে, সম্ভবতঃ কন্যাটি বয়স্কা বলিয়াই, তিনি হরিচরণের কন্যাটিকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; বিবাহ হইলে হরিচরণের কন্যা ত রাজরাণী হইবেনই, বাবুর শ্বশুররূপে অভিষিক্ত হইয়া হরিচরণেরও সমস্ত দুঃখের অবসান হইবে। তখন পেন্সনের টাকায় শুধু তামাকু পোড়াইলেও কোন ক্ষতি হইবে না।

গোমস্তার কথা শুনিয়া হরিচরণ শুষ্ক হইয়া উঠিলেন। কিছুতেই হইবে না, কোনমতেই না! তাহা হইলে ত অগ্নিগর্ভেও কন্যাটিকে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে! মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে হরিচরণ কহিলেন, "কিন্তু সে কেমন ক'রে হবে? তাঁরা বড়লোক, আমি গরীব!—"

গোমস্তার বিরাট হাস্যধ্বনিতে শীতের স্তব্ধ প্রভাত চকিত হইয়া উঠিল। হাস্যের তরঙ্গ প্রশমিত হইলে গোমস্তা আশ্বাস প্রদান করিল যে, সেজন্য হরিচরণের চিন্তার কোন কারণ নাই, তাহার প্রভু, হরিচরণের নিকট একটি হরিতকীরও প্রার্থী নহেন; সমুদ্র গোষ্পদের নিকট জল-প্রার্থী হইতে পারে না, মেঘ ধূম্রের নিকট বাষ্প-সঞ্চয়ের প্রত্যাশী নহে। পক্ষান্তরে হরিচরণ প্রার্থনা করিলে সুধীরচন্দ্র কন্যাপক্ষেরও সমগ্র ব্যয়-ভার বহন করিতে সম্মত হইতে পারেন।

কিন্তু তত্রাচ সুবিধা হইল না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকালব্যাপী তর্ক এবং আলোচনার পর স্পষ্ট বুঝা গেল, সুধীরচন্দ্রের সহিত সুরমার বিবাহ দিতে হরিচরণ সম্পূর্ণ অসম্মত। হরিচরণ কহিলেন, "গোপালবাবু, আমি বয়সে

আপনার চেয়ে বড়। আপনার চেয়ে অভিজ্ঞতা কিছু বেশী আছেই। আপনি ঠিক জান্‌বেন, এরূপ কুটুম্বিতায় কথনও সুখ হয় না। আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, আমি অপারক।"

"অপারক ?" গোপাল ক্রোধে এবং ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, "অপারক নয় হরিচরণবাবু, পাগল! এত বড় সুযোগকে যে প্রত্যাখ্যান করে, তার মত জীব পাগ্‌লা গারদেও বিরল। আমি চল্লাম, কিন্তু স্থির জান্‌বেন, এর জন্য একদিন আপনাকে পরিতাপ কর্‌তেই হবে!"

গোপালের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া সুধীরচন্দ্র কহিল, "তুমি যে কাজে যাও, সেই কাজই পণ্ড হয়! আমি অন্য কাউকে পাঠাব। হরিচরণ যে আমার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে অসম্মত হবে, এ একেবারে অসম্ভব!"

সুধীরচন্দ্রের পক্ষ হইতে আর একজন লোক বিবাহের প্রস্তাব লইয়া হরিচরণের নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু হরিচরণের সেই এক কথা। অধিকন্তু, হরিচরণ এবার স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন যে, শিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র পাত্র ভিন্ন তিনি কন্যা সমর্পণ করিবেন না।

হরিচরণের কথা দশগুণ রঞ্জিত হইয়া সুধীরচন্দ্রের নিকট পৌঁছিল। ক্রোধে ও অপমানে সুধীর অস্থির হইয়া উঠিল।—"এত দূর স্পর্দ্ধা! ইহার প্রতিশোধ লইতেই হইবে, তা সে যে প্রকারেই হউক না কেন!"

গোপাল নিকটেই ছিল, কহিল, "তার আর কি? একবার হুকুম দিন না, হতভাগাকে ভাল ক'রে শিক্ষা দি।"

"কি ক'রে?"

"যদু বোসের কাছে হরিচরণের একটা হ্যাণ্ডনোট আছে। সুদে আসলে ছ' শ' টাকা দিলে এথনই সে আমাদের তা বিক্রয় করে। হ্যাণ্ডনোটটা একবার আমাদের হাতে এলে দেখে নি, কত ধানে কত চা'ল!"

উৎফুল্লভাবে সুধীর কহিল, "আজই হ্যাণ্ডনোটটা কেনবার ব্যবস্থা কর।"

দিন দশেকের মধ্যে ছয় শত টাকার দাবীতে হরিচরণের নামে সুধীরচন্দ্র আদালতে নালিশ করিল। গোপাল স্বয়ং শমন দিতে গেল। হরিচরণের হস্তে শমন প্রদান করিয়া গোপাল কহিল, "এখনও যদি ভাল চাও ত গিয়ে বাবুর হাতে পায়ে ধর, আর তাঁর পায়ে মেয়েটাকে অর্পণ কর। দেখ্‌ছ ত একবার ঠ্যালাটা!"

হরিচরণের চক্ষু ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রুক্ষস্বরে সে কহিল, "তোমার বাবুকে এ দুরাশা ত্যাগ কর্‌তে বল। তাঁর পূর্ব্বজন্মের এমন কোনও সুকৃতি নাই, যাহাতে তিনি এ উচ্চ আশা পোষণ কর্‌তে পারেন। দুশ্চরিত্র মাতাল আমার কন্যার পদস্পর্শ কর্‌বারও অধিকার পাবে না।"

গোপালের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া সুধীর বলিল, "আচ্ছা, দু'দিন পরেই যখন হাত ধ'রে পথে টেনে বা'র কর্‌ব, তখন কোথায় যান দেখা যাবে!"

কিন্তু মকদ্দমার তারিখের তিন দিবস পূর্ব্বে বিষণ্ণমুখে গোপাল আসিয়া সুধীরচন্দ্রকে সংবাদ দিল যে, হরিচরণ মকদ্দমার সমস্ত টাকা এবং খরচা আদালতে জমা দিয়াছে।

সে রাত্রে বিফলতার বেদনায় সুধীরচন্দ্রের ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না। মৃতা স্ত্রীর অবশিষ্ট দুইখানি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া এবং বসতবাটীখানি বন্ধক রাখিয়া কোন প্রকারে হরিচরণ সুধীরচন্দ্রের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন। কিন্তু অবস্থাটা এমন হইয়া পড়িল যে, ইহার পর আর দ্বিতীয় বিপত্তিতে উদ্ধার পাইবার পথ রহিল না।

উৎকণ্ঠিত চিত্তে সুরমা কহিল, "বাবা, চল, কল্‌কাতা ছেড়ে আমরা আর কোন দেশে চ'লে যাই।"

হরিচরণ সস্নেহে কন্যার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "ভয় কি মা, ভগবানের দয়া থাকৃলে কোন বিপদেই ভয় নেই।"

এই ঘটনার পর হইতে বৃদ্ধ হরিচরণের পক্ষে সংসার পরিচালনা করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া আসিতে লাগিল। আজ গয়লা আসিয়া দুধের বাকি মূল্যের জন্য উৎপীড়ন করে, কাল মুদী আসিয়া নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইয়া যায়, পরদিন কাপড়ের দোকান হইতে উকিলের চিঠি আসে। চতুর্দ্দিক যেন একটা নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়া সহসা কঠিন হইয়া উঠিল! অন্তরালে অবস্থান করিয়া কে যে এই যন্ত্রণার যন্ত্রটি পরিচালিত করিতেছিল, সে বিষয়ে সুরমা এবং তাহার পিতার অনুমাত্র সন্দেহের কারণ ছিল না; এবং মুদী, গয়লা, দোকানদারদের অত্যাচাব যে পরিমাণে দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার দশগুণ সুধীরচন্দ্রের প্রতি তাহাদের, পিতা ও কন্যার, একটা তীব্র বিদ্বেষ, একটা সুগভীর অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভয়ের পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা দর্শন দিল; পরাজয়ের স্থান পরাক্রম আসিয়া অধিকার করিল।

পথে যখন সুধীরচন্দ্রকে দেখা যাইত, তখন সুরমা ঘৃণায় তাহার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইত। তাহার নিরীহ পিতাকে অকারণে যে বিপন্ন করিতেছে, তাহার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র করুণা ছিল না। সুরমাকে বারাণ্ডার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ সুধীরচন্দ্র যখন তাহার প্রতি অশিষ্ট ইঙ্গিত প্রয়োগ করিত, তখন তীব্র অপমানে সুরমার স্নিগ্ধনেত্রদু'টি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলিয়া উঠিত; তাহাতে সুধীরের দেহ অক্ষুণ্ণ রহিত বটে, কিন্তু মন দগ্ধ হইতে থাকিত।

সে দিন মাসের প্রথম তারিখ। হরিচরণ পেন্সন আনিতে গৃহ

হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন, ঝিও তখন গৃহে ছিল না। সুরমা একাকিনী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় সহসা সুধীর গৃহের অভ্যন্তরে একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অকুণ্ঠিতভাবে সুধীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে সুরমা কহিল, "আপনি এখানে কেন এসেছেন ? যান, বাইরে যান !"

সুমিষ্টকণ্ঠে সুধীর কহিল, "তোমার কোন ভয় নেই। আমার কথা শোন, ছেলেমানুষী করো না। তোমার বাবা ত কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন না। বিবাহ না হয় নাই হ'ল, তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমাকে রাণীর মত রাখ্‌ব। গহনায় তোমার গা মুড়ে দেব ; আর টাকা দেব—যত চাও, তত !"

সুরমা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। তাহার মুখ হইতে সহজে বাক্য নিঃসরণ হইতেছিল না !—"যান আপনি, শীঘ্র বেরিয়ে যান, এখনি—"

সুধীর কহিল, "তোমার বোধ হয় বিশ্বাস হচ্ছে না ! ভাব্‌ছ, আমি প্রতারণা কর্‌ছি, তোমাকে জব্দ কর্‌ব ব'লে। এই দেখ, তোমার জন্য একতাড়া নোট এনেছি, আর তোমার গলার জন্য একছড়া হার।"

বস্ত্রমধ্য হইতে সুধীর একখানি বহুমূল্য রত্নখচিত হার বাহির করিল। সেই উজ্জ্বল অলঙ্কারগাত্রে সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া সহস্র প্রভায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া গেল।

তখন সুরমার চক্ষু দুইটি দীপ্ত অগ্নিকণার মত জ্বলিতেছিল, সমগ্র মুখমণ্ডল তপ্ত লৌহের মত রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সমস্ত দেহ ক্রোধভরে বেতসের মত কম্পিত হইতেছিল।

সুরমার সেই দৃপ্ত ভঙ্গিমা দেখিয়া সুধীর বিব্রত হইয়া উঠিল। ভগ্ন-কণ্ঠে সে কহিল, "এ সব চাও না তুমি ? নেবে না ?"

সুরমা উচ্চস্বরে কহিল, "আর এক মিনিট যদি আপনি এখানে

কেন, তা হ'লে অপমানিত হবেন, আমি চেঁচিয়ে লোক জড় করব ;" লিয়া দ্রুতপদে সুরমা পথের ধারের বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল।

তখন অগত্যা ত্বরিতবেগে সুধীরচন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। সে দিন সুধীর বুঝিয়াছিল, লৌহকে তপ্ত করিলে রক্তিম হয় বটে, কিন্তু তখন তাহাকে আর স্পর্শ করা চলে না।

প্রায় তিন মাস পরে একদিন প্রত্যূষে সুধীর পথ দিয়া যাইতেছিল। সে দেখিল, বারাণ্ডায় সুরমা দাঁড়াইয়া আছে। এই তিন মাসের মধ্যে আর একদিনের জন্যও সুধীর সুরমাকে দেখিবার সুযোগ পায় নাই, সুরমা আর বারাণ্ডায় দাঁড়াইত না। সেদিনকার অপমানের তীক্ষ্ণ কণ্টক তখনও সুধীরের মনের মধ্যে বিঁধিয়া ছিল। সুরমাকে বারাণ্ডায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে অপমানিত করিবার জন্য সুধীর নিজকে প্রস্তুত করিয়া লইল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, যেন সুরমা হস্ত-সঙ্কেতে তাহাকে ডাকিতেছে। কিন্তু না, ইহা অসম্ভব! তাহা কি হইতে পারে? সুধীর ভাবিল, নিশ্চয়ই সে ভুল বুঝিয়াছে। কিন্তু পুনরায় সে দেখিল, হস্ত সঞ্চালন করিয়া সুরমা তাহাকেই ডাকিতেছে। সে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, আর কেহ নাই, সুরমা নিশ্চয়ই অন্য কাহাকেও ডাকিতেছে না। তবে কি সে তাহাকেই আহ্বান করিতেছে? এ কি দুর্ভেদ্য রহস্য! এ ঘটনা যে স্বপ্নেরও অগোচর!

নিকটে আসিয়া সুধীর সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ডাকছ?"

ঘাড় নাড়িয়া কম্পিতকণ্ঠে সুরমা বলিল, "হ্যাঁ, একবার উপরে আসুন।"

সুধীর মনে মনে হাসিল। সেই যদি স্বীকৃত হইতে হইল, তাহা হইলে এত লীলা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? সুধীর ভাবিল, সে আর কিছুই

নয়, শুধু দর-কষাকষি করা! হায় রে অর্থ, জগতের মধ্যে একমাত্র তুমিই প্রবল! পর-মুহূর্ত্তে যাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, সে অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া কি ফল?

দ্রুতপদে সুধীর গৃহে প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়ির সম্মুখেই সুরমা সুধীরের অপেক্ষায় প্রস্তুত ছিল; সুধীর উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌ছ?"

সুরমা ভূমির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরস্বরে কহিল, "অনুগ্রহ ক'রে আমাকে কিছু টাকা দিন। আপনি ত আমাকে টাকা দিতে স্বীকৃত ছিলেন, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছি।" সুরমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

বিস্মিত সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার টাকার এমন কি প্রয়োজন হ'ল?"

কতকটা নিজকে সংযত করিয়া লইয়া সুরমা কহিল, "আজ দশ দিন বাবার ভয়ানক অসুখ। হাতে আমার একটি পয়সা নেই। তিন দিন থেকে বাবার চেতনা নেই। কাল থেকে ডাক্তার দেখান বন্ধ আছে, আজ পথ্যেরও সংস্থান নেই। ঝিকে আমাদের পরিচিত সকলের কাছে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ সাহায্য করে নি। দু'দিন থেকে ঝি খরচ চালাচ্ছিল, আজ তারও পয়সা ফুরিয়েছে! আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন ত বাবার পা ছুঁয়ে শপথ কর্‌তে আমি প্রস্তুত আছি, বাবার অসুখ ভাল হয়ে গেলে আপনি আমাকে যা বল্‌বেন, আমি তাই মেনে চল্‌ব। আজ আমাকে কিছু টাকা দিন—"

সুধীর স্তম্ভিত হইয়া সুরমার কথা শুনিতেছিল। আর এক দিন সে দৃপ্ত তেজের মধ্যে সুরমাকে দেখিয়াছিল, কিন্তু সে নিদাঘের উজ্জ্বল পুষ্পটাকে আজ কে যেন বর্ষার সকরুণ ধারায় সিক্ত করিয়া দিয়াছে।

আজ তাহার চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পরিবর্ত্তে অশ্রুকণা এবং মুখে রক্তোচ্ছ্বাসের পরিবর্ত্তে মলিনতা! সেদিন যে বাষ্পের মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ সে হিমের মত অসাড়! সে দিন যে ক্রোধের মত গর্ব্বিতা ছিল, আজ সে করুণার মত নম্র!

সুধীর কিছুক্ষণ হত-চেতনের মত সেই স্নিগ্ধ কোমল, পবিত্র সৌন্দর্য্য-ধারা পান করিয়া লইল, তাহার পর ধীরস্বরে কহিল, "আপাততঃ, আমার মনিব্যাগটা তোমার কাছে দিয়ে যাচ্ছি, একটু পরেই আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব;" বলিয়া সুধীর তাহার মনিব্যাগ সুরমার পদপ্রান্তে রাখিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

এক ঘণ্টা পরে সুধীরের একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী আসিয়া সুরমার হস্তে দুই শত টাকা এবং একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রে লিখিত ছিল,—"উপস্থিত তোমাকে দুই শত টাকা পাঠাইলাম। যেমন যেমন প্রয়োজন হইবে, আমাকে লিখিলেই পাঠাইয়া দিব। যে টাকা পাঠাইলাম এবং পাঠাইব তাহার জন্য তোমাকে আমার নিকট কোনও সর্ত্তে বাধ্য থাকিতে হইবে না। তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবে। আমি দুশ্চরিত্র, কিন্তু একবারে পশু নহি।"

সুধীরের পত্র পাঠ করিয়া সুরমার দুই চক্ষে মুক্তাবিন্দুর মত দুইটি পবিত্র অশ্রুকণা ফুটিয়া উঠিল। তাহা কি শুধু শুষ্ক কৃতজ্ঞতারই অশ্রু? না! একটি সুনির্ম্মল শ্রদ্ধার উদ্দীপনাতেও সুরমার অন্তর ভরিয়া গেল।

জীবন-নাট্য

১

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান মাতৃহীনা সুপ্রভা যখন পঞ্চদশ বৎসরে পদার্পণ করিল, তখনও গৌরীকান্তবাবুকে তাহার বিবাহের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য বোধ করিত। গৌরীকান্তর বিপুল ঐশ্বর্য্যের লোভেই হউক বা সুপ্রভার সৌন্দর্য্যের আকর্ষণেই হউক, প্রতিনিয়তই গৌরীকান্তবাবুর নিকট সুপ্রভার সহিত বিবাহের প্রস্তাব লইয়া বহুসংখ্যক আবেদন, নিবেদন, আমন্ত্রণ, এমন কি আকিঞ্চন পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইত ; কিন্তু কিছুতেই সুবিধা ঘটিয়া উঠিত না। চসমা-পম্প্‌সু-শোভিত জমিদারপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া গুম্ফশ্মশ্রুহীন সদ্যোজাত ব্যারিষ্টার পর্য্যন্ত কাহারও অভাব ছিল না, কিন্তু সকলেই এক উত্তর লাভ করিয়া ফিরিত,—হইবে না !

গৌরীকান্তবাবুর এরূপভাবে নিশ্চিন্ত থাকিবার যে কারণ ছিল না, তাহা নহে। অর্থের তাঁহার অভাব ছিল না এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার কন্যাই যখন সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, তখন অবশিষ্ট জীবনের একমাত্র বন্ধন সেই কন্যাটির বিনিময়ে ধনবান্ জামাতা লাভ করিবার পক্ষে তাঁহার কিছুমাত্র প্রলোভন হইত না। সেইজন্য তিনি তাঁহার পরলোক-গত বন্ধুর পুত্র অজিতকুমারের সহিত সুপ্রভার বিবাহ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কথা ছিল, বি-এ পরীক্ষার পরই অজিতের সুপ্রভার সহিত বিবাহ হইবে।

অজিতের সহিত বিবাহ হইলে সুপ্রভা তাঁহারই নিকট থাকিতে পারিবে, শুধু যে সেই কারণেই গৌরীকান্ত অজিতের সহিত সুপ্রভার

বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা নহে। আশৈশব পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়া সুপ্রভা এবং অজিতের মধ্যে আকর্ষণের একটা অঙ্কুর জন্মাইয়াছিল, এবং সেই অঙ্কুর, ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত, একটা যে নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণতি লাভ করিতেছিল, তাহা বিচক্ষণ গৌরীকান্তর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি আপনার এবং কন্যার, উভয়ের মঙ্গলের প্রতিদৃষ্টি রাখিয়া অজিতকুমারের সহিত সুপ্রভার বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন।

অজিত তাহার পরীক্ষার পুস্তক অধ্যয়ন করিতে করিতে ভাবিত, কবে এই পুস্তকগুলা তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিবে যে, সে তাহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করিয়া নব-জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে! সুপ্রভা তাহার সূচীকার্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিত, কবে সে দিন আসিবে, যে দিন সে তাহার প্রেমাস্পদের চরণে নিজের পুলক-কম্পিত হৃদয়খানি সম্পূর্ণভাবে বিলীন করিয়া দিয়া চরিতার্থ হইবে!

সে বৎসর কলিকাতা সহরে বসন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। পরীক্ষা দিয়া অজিতকুমার দেশে তাহার এক দূর-সম্পর্কীয় পিতৃব্যের নিকট বাস করিতেছিল; তাহার ইচ্ছা ছিল, বসন্তের প্রকোপ কমিলে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবে। এক দিন গৌরীকান্তবাবুর নিকট হইতে অজিত এক খানি পত্র পাইল। তিনি লিখিয়াছেন, সুপ্রভা অতি সঙ্কটাপন্নভাবে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, ভগবানের কৃপায় কোন প্রকারে তাহার জীবন রক্ষা পাইয়াছে।

কলিকাতায় আসিয়া অজিত সুপ্রভাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, শুধু জীবনটুকুই রক্ষা পাইয়াছে বটে, আর সকলই গিয়াছে! সে বর্ণ নাই, সে লাবণ্য নাই, এমন কি সে গঠন পর্য্যন্ত যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া

গিয়াছে! ব্রণাঙ্কিত মুখের মধ্যে এমন একটা ভাব আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে হয়, যেন সুনির্ম্মল রজনীগন্ধার উপর নির্ম্মমভাবে মসী লেপন করিয়া দিয়াছে!

সুপ্রভার অবস্থা দেখিয়া অজিতের চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। সে বলিল, "তুমি যে সেরে উঠেছ, এই আমাদের পরম সৌভাগ্য!"

কিন্তু গৃহে ফিরিয়া রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া অজিত চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার দুর্ব্বল হৃদয় কর্ত্তব্যের আদর্শ হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সুপ্রভার অবস্থা দেখিয়া চক্ষে জল আসে, মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে, কিন্তু উপস্থিত অবস্থায় সুপ্রভাকে বিবাহ করা চলে কিরূপে? এই ব্রণাঙ্কিত মুখ দেখিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করা, আর এই রোগদগ্ধ মলিন বর্ণের দ্বারা আজীবন চক্ষুকে পীড়ন করা,—অসম্ভব!

সুপ্রভার বিপুল ঐশ্বর্য্য! হউক, অর্থের জন্য জীবনটাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা যায় না! দরিদ্রের পর্ণকুটিরেও আনন্দের সহিত জীবন যাপন করা চলে, যদি একখানি হাস্যমধুর সুনির্ম্মল মুখ চক্ষের সম্মুখে দিবারাত্র ভাসিয়া বেড়ায়!

শুধু সুপ্রভার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে করিয়া অজিত অন্তরের মধ্যে একটা তীব্র গ্লানি বোধ করিতেছিল। সে কি ভাবিবে, সে কি মনে করিবে, সে কি মর্ম্মস্পর্শী যন্ত্রণা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে! কিন্তু মনের এরূপ বিমুখ ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সুপ্রভাকে বিবাহ করা—তাহাকেও ত অকপট আচরণ বলা যায় না, তাহাও ত অনেকটা প্রতারণার মতই হইয়া দাঁড়ায়!

অজিতকুমার সুপ্রভাদের বাটী যাওয়া এবং সুপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ করা ক্রমশঃ কমাইয়া ফেলিল। নিতান্ত যখন সুপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা এমন সংক্ষিপ্ত এবং সঙ্কুচিত

আকার ধারণ করে যে, উভয়ের মনের সহজ এবং স্বচ্ছন্দ গতির বিরুদ্ধে একটা যে অন্তরায় ঠেলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

অবিলম্বেই সুপ্রভা তাহা বুঝিতে পারিল এবং গৌরীকান্তর পক্ষ হইতেও তাহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না।

গৌরীকান্ত তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া অলসভাবে একটা সিগার ভস্ম করিতেছিলেন, অজিত আসিয়া কহিল, "আপনি আমাকে ডেকেছেন?"

অ্যাশ্ ট্রের উপর সিগারটা রাখিয়া গৌরীকান্ত বলিলেন, "হ্যা, তোমার ত এক্‌জামিন হয়ে গিয়েছে—এইবার বিবাহের একটা দিন স্থির ক'রে ফেলা যাক্!"

একবার ইতস্ততঃ করিয়া, ঢোঁক গিলিয়া, ভূমির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অজিত কহিল, "তা আচ্ছা! তবে তার পূর্ব্বে একবার কাকার মতটা লওয়া আবশ্যক—"

গৌরীকান্তর চক্ষু প্রজ্বলিত অঙ্গারের মত জ্বলিয়া উঠিল।—"এতদিন ধ'রে যে আমার কন্যাকে প্রলুব্ধ ক'রে এসেছ, তার জন্যে তোমার কাকার মত নেবার প্রয়োজন মনে হয়েছিল কি? কোন আবশ্যক নেই তোমার কাকার মত নেবার! তোমার কাকা যদি আমার পায়ে ধ'রে সাধনা করেন, তা হ'লেও তোমার মত লঘু-প্রকৃতির হস্তে আমার মেয়েকে আমি সমর্পণ কর্‌ব না। বিবাহের পর যদি আমার কন্যার বসন্ত হ'ত, তা হ'লে তোমার মত দুর্ব্বৃত্তের হাতে তার কি নিগ্রহটাই না হ'ত! ভগবান্ আমাকে রক্ষা করেছেন যে, যথাসময়ে আমি তোমার পরিচয় পেয়েছি। এখন তুমি এখান থেকে দূর হও, আর কখন এ গৃহে প্রবেশ করো না।"

স্তম্ভিত অজিত ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

* * * *

দুই মাসের মধ্যে মনোরমাকে বিবাহ করিয়া অজিত প্রমাণ করিল যে, সুপ্রভা এবং গৌরীকান্তবাবুর আশঙ্কা ভিত্তিহীন ছিল না।

২

মনোরমাকে বিবাহ করিবার পর সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে পরিবর্ত্তনও অনেক ঘটিয়াছে। গৌরীকান্তবাবু ইহজগত হইতে অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন, দুর্ভাগিনী সুপ্রভা বিধবা হইয়াছে, এবং অজিতকুমার অপব্যয় এবং অসঞ্চয়ের দ্বারা অতি শোচনীয়ভাবে সংসার চালাইতেছে।

মার্চ্চেন্ট্ আফিসে কাজ করিয়া সে মাসিক এক শত টাকা বেতন পায়। কিন্তু উড়াইয়া দেওয়ার কৌশল যে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট এক শতই কি, আর এক লক্ষই কি! মাসকাবার হইবার পঁচিশ দিন বাকি থাকিয়া যায়, কিন্তু হাতে পঁচিশটি টাকাও বাকি থাকে না! তখন মনোরমা সংসার লইয়া বিব্রত হইয়া উঠে। চালাইবার উপায় নাই, অথচ তাহাকে চালাইতেই হইবে! সে যে কি কঠিন এবং কি কষ্টকর ব্যাপার, তাহা যে ভোগ করিয়াছে, সেই জানে!

কিন্তু তাই বলিয়া মনোরমার মুখে তরল মিষ্ট হাস্যটুকুর অভাব কোন দিন দেখা যাইত না। সে তাহার মনের শক্তির বলে এবং দেহের রক্তের বিনিময়ে যেটুকু সঞ্চয় এবং সুবিধা করিত, তাহার স্বামী নিরুদ্বেগে এবং অকাতরে তাহার দশগুণ অপব্যয় করিয়া ফেলিত, তথাপি মনোরমার মুখে সহজ হাস্যটুকু, দুঃসময়ের সান্ত্বনার মত, সর্ব্বদা ফুটিয়া থাকিত।

কিন্তু যখন অভাব এবং দারিদ্র্যে পীড়িত হইয়া দুর্ব্বল-প্রকৃতি অজিত

বলে, "যদি সুপ্রভার সহিত আমার বিবাহ হ'ত, তা হ'লে এখন টাকার ভাবনা না ভেবে গড়ের মাঠে ল্যাণ্ডো ক'রে বেড়িয়ে বেড়াতাম"; তখন দুঃখে ও বেদনায় মনোরমার চক্ষু জলে ভরিয়া যায়! সংসারের ইষ্টের জন্ম দেহক্ষয় এবং জীবন-পণ করা, তখন তাহার নিকট নিরর্থক বলিয়া মনে হয়! সে কি করিবে? সে কি করিতে পারে? একটির পর একটি করিয়া সমস্ত অলঙ্কার নিঃশেষিত করার পর যদি গহনা দিয়া স্বামীকে সাহায্য করার পথ বন্ধ হইয়া যায়, তাহাতে তাহার কি অপরাধ থাকিতে পারে?

অজিত যে ঠিক মনোরমাকে কষ্ট দিবার উদ্দেশ্যেই সুপ্রভার প্রসঙ্গ তুলিত, তাহা নহে; কিন্তু অর্থের অভাবে যখন সে কষ্ট পাইত, তখনই সে সুপ্রভা এবং তাহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের কথা উত্থাপন করিতে ভুলিত না। শুধু তাহাই নহে, তাহার মধ্যে যেন কতকটা আক্ষেপ এবং অনুশোচনার সুখও মিশ্রিত থাকিত।

হয় ত, আজকাল অজিতের পূর্ব্ব মত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! হয় ত, এখন তাহার মনে হয় যে, মুখে বসন্তের দাগ থাকিলেও তাহাকে লইয়া সুখে দিনাতিপাত করা চলে, যদি সেই বসন্তের দাগের সহিত ব্যাঙ্কে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত থাকে!

অজিতের এই ভাবটা যখন তাহার আচরণ এবং কথাবার্ত্তার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তখন বেচারী মনোরমার বেদনাহত হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করে! সুপ্রভা এবং সুপ্রভার ঐশ্বর্য্যের উপর একটা বিদ্বেষ যেন অপ্রতিহতভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়! সে তাহার সমস্ত জীবন দিয়া স্বামীর মনস্তুষ্টি করিতে পারিতেছে না, অথচ সুপ্রভা তাহার স্বামীর মন আকর্ষণ করিতেছে তুচ্ছ অর্থের প্রভাবে! ভালবাসা, জীবনোৎসর্গ, সে সকল কিছুই নয়; তাহার

স্বামী শুধু অর্থই চিনিয়াছেন! অথচ তিনি যে অর্থকে চিনিয়াছেন, তাহা তাঁহার অমিত ব্যয়ের দ্বারা কোন ক্রমেই প্রকাশ পায় না।

মনোরমার সুমধুর হাস্যটুকু ক্রমশঃ প্রত্যূষের চন্দ্র-সুষমার মত পাণ্ডু হইয়া আসিতে লাগিল! কুসুমের মধ্যে কীট প্রবেশ করিল!

৩

অবশেষে একদিন যখন মনোরমা শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল, তখন অজিত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মনোরমার পেটের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা, তাহার সহিত প্রবল জ্বর! পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে মুখে অজিত নিরন্তর হাস্য দেখিয়া আসিয়াছে, আজ যন্ত্রণায় তাহা ম্লান, নিষ্প্রভ। স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য গভীর যন্ত্রণার মধ্যেও যখন মনোরমার মুখে দিবালোকে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত ক্ষীণ হাস্য ফুটিয়া উঠে, তখন নিবিড় বেদনাভরে অজিতের মন নিপীড়িত হইতে থাকে! একটা নিষ্ঠুর আশঙ্কায় তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠে! মনোরমা যদি না বাঁচে! তাহার দুঃখ-ক্লিষ্ট সংসারের একমাত্র সুখ, অভিশপ্ত জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, মনোরমা, যদি তাপদগ্ধ পুষ্পের মত সহসা ঝরিয়া যায়! তাহা হইলে সে কি লইয়া বাঁচিবে? তাহা হইলে আর কাহার উপর সে নির্ভর করিবে?

চিন্তাকুল অজিত নীলমাধব ডাক্তারকে লইয়া আসিল। নীলমাধব রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"রোগ কঠিন, পেটের ভিতর ফোড়া হইয়াছে, অবিলম্বে অস্ত্রপ্রয়োগের সাহায্য লইতে হইবে। সেই দিন হইলেই ভাল হয়, একান্ত পক্ষে তাহার পরদিন।"

পরদিনের জন্যই কথা হইল। অস্ত্রপ্রয়োগে কত ব্যয় হইবে, অজিত নীলমাধববাবুকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিল। ব্যয়ের কথাটাই দরিদ্রের সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ে!

নীলমাধববাবু বলিলেন, "অস্ত্রাঘাতের দিন এবং তাহার পর দশ দিনের জন্য অন্ততঃ পাঁচ শত টাকা মজুত রাখিতে হইবে।"

তিন দিন পরে মাহিনা পাওয়া যাইবে—তখন অন্য সকল খরচ বন্ধ রাখিয়া, অনাহারে থাকিয়া মনোরমার চিকিৎসা করিলে চলিবে! কিন্তু উপস্থিত পাঁচ শত টাকার সংস্থান কি করিয়া হয়? ঘরে ত পাঁচটী টাকাও নাই এবং এমন সামগ্রীও নাই, যাহার বিনিময়ে পঞ্চাশটা টাকাও সংগ্রহ করা যাইতে পারে!

নীলমাধব ডাক্তার বলিলেন, "কাল সকালে সার্জ্জেন কেলীকে নিয়ে আস্‌তে হবে। তিনি এসে অপারেশনের জন্য যা আবশ্যক, ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। অপারেশন বিকালে হবে।"

রাত্রি দশটার সময় নৈরাশ্য পীড়িত হৃদয়ে অজিত আসিয়া মনোরমার পার্শ্বে বসিল। সমস্ত দিন ধরিয়া সে, তাহার যত বন্ধু আছে, সকলের নিকট ঋণের জন্য ঘুরিয়াছে। কিন্তু বৃথা, কোন ফল হয় নাই! পাঁচ শত টাকা ত দূরের কথা, পঞ্চাশ টাকাও কেহ দিতে স্বীকৃত হয় নাই! যাহার চক্ষুলজ্জা আছে, সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে এবং যে স্পষ্টবাদী, সে কতকটা রূঢ় কথা বলিয়াছে। কেহ বলিয়াছে, নাই; কেহ বা প্রায় বলিয়াছে, দিব না। একজন বলিয়াছে, "স্ত্রীর এমন গুরুতর অসুখ, গহনাগুলা বাক্সে পড়িয়া কি করিতেছে? আজকাল কি কেউ শুধু হাতে টাকা দেয়?" নির্ম্মম! অর্থকীট। সে উপায় যদি থাকিত, তাহা হইলে কি তোমাদের মত হৃদয়-হীনের দ্বারে দ্বারে মাথা নত করিয়া ফিরিতাম! তোমরা শুধু অনাদায়ের কথাটাই ভাবিতে জান, কিন্তু একটা জীবন যে অর্থাভাবে মৃত্যুর দিকে চলিয়া পড়িতেছে, তাহাতে তোমাদের কঠিন মন এতটুকু বিচলিত হয় না!

অজিতের হাত নিজ হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিয়া মনোরমা কহিল, "সমস্ত দিন কোথায় ছিলে ?"

"টাকার চেষ্টায় গিয়েছিলাম।"

"কত টাকা ?"

"পাঁচ শ’।"

"পেলে ?"

"না।"

অজিতের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া মনোরমা বলিল, "ভালই হয়েছে। অতগুলা টাকা নষ্ট ক’রে কি হবে ? পরমায়ু যদি থাকে, আমি অমনিই ভাল হ’য়ে উঠ্‌ব।"

মনোরমার কথা শুনিয়া অজিতের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। এই দেবী-প্রকৃতি মনোরমাকে যদি ধরিয়া রাখা না যায়, এই পবিত্রতার স্নিগ্ধ সৌরভটুকু যদি তাহার দুরদৃষ্টে মহানীলিমার মধ্যে নিঃশেষ লাভ করে! অজিতের চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু মনোরমার হস্তের উপর ঝরিয়া পড়িল।

মনোরমা অজিতের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্নেহভরে কহিল, "ছি, ছেলেমানুষী করো না। ডাক্তারবা কি না বলে, তাদের কথায় কি বিশ্বাস কব্‌তে আছে ? রোজ তোমার পায়ের ধূল আমার মাথায় দিয়ো, তাতেই আমার রোগ সেরে যাবে।"

মনোরমার কথা শুনিয়া অজিত অস্থির হইয়া উঠিল।—"শুধু পায়ের ধূলা দিয়া নিশ্চেষ্টভাবে তোমার মৃত্যু দেখিব, মনোরমা! কখনই নয়! টাকা চাই, টাকা চাই! যেরূপে হয়, টাকার ব্যবস্থা করিতেই হইবে!"

সমস্ত রাত্রি উৎকট চিন্তায় অজিতের নিদ্রা হইল না। প্রত্যূষে একটা উপায় তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল। সুপ্রভার নিকট একবার

টাকাটা চাহিয়া দেখিলে কি হয়? তাহার প্রতি সে যেরূপ গুরুতর অত্যাচার করিয়াছে, তাহাতে তাহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করা নিতান্ত নির্লজ্জের মত দেখায় বটে, কিন্তু উপায়ও ত নাই! মনোরমাকে বাঁচাইবার জন্য সে এখন সব লজ্জা, সব গ্লানি মাথায় তুলিয়া লইতে প্রস্তুত!

অজিত তখনই সুপ্রভার নামে একখানা পত্র লিখিয়া সুপ্রভার গৃহে পাঠাইয়া দিল।

এক ঘণ্টা পরে সুপ্রভার একজন কর্ম্মচারী একখানা খামে মোড়া পত্র আনিয়া অজিতের হস্তে দিল। অজিত পত্রখানা খুলিয়া দেখিল, সুপ্রভা লিখিয়াছে,—"আপনার স্ত্রীর এরূপ কঠিন অসুখের সংবাদে নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। পত্রমধ্যে পাঁচ শত টাকার একখানা চেক পাঠাইলাম। এই সামান্য ব্যাপারে এত সঙ্কোচের কোন কারণ ছিল না, হ্যাণ্ডনোটেরও কোন প্রয়োজন নাই। যখন আপনার সুবিধা হইবে, তখন টাকা ফেরৎ দিবেন; তাহার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অপারেশন হইয়া যাওয়ার পর আপনার স্ত্রী কেমন থাকেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন, তাঁহার জন্য বিশেষ চিন্তিত রহিলাম।"

সুপ্রভার পত্র পাঠ করিয়া কৃতজ্ঞতায় অজিতের চক্ষে জল আসিল। এত উদার অন্তঃকরণ তোমার, সুপ্রভা! হৃদয়হীনের প্রতি তোমার এত সহৃদয়তা! উৎপীড়কের প্রতি এত করুণা!

মনোরমার নিকট গিয়া প্রফুল্লমুখে অজিত বলিল, "আর আমার কোন ভাবনা নেই, মনোরমা, পাঁচ শ' টাকার ব্যবস্থা হয়েছে!"

বিস্মিত মনোরমা স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "কেমন ক'রে হ'ল?"

চেকখানা দেখাইয়া অজিত বলিল, "আজ সকালে আর কোনও

উপায় নেই দেখে সুপ্রভাকে টাকার জন্য চিঠি লিখেছিলাম। সুপ্রভার একজন কর্ম্মচারী এইমাত্র সুপ্রভার একখানা চিঠি আর এই চেকখানা দিয়ে গেল।"

মনোরমা কিয়ৎক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর, "বেশ!" বলিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

একটা সূক্ষ্ম অথচ তীব্র বেদনা মনোরমার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতেছিল। অবশেষে সুপ্রভার অর্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল! এই কঠিন এবং ব্যয়-বহুল রোগ অতিক্রম করিয়া কোনরূপে যদি সে বাঁচিয়া উঠিতে পারে, তখন সে তাহার প্রতি নিঃশ্বাসের জন্য সুপ্রভার নিকট ঋণী হইয়া পড়িবে। তাহার স্বামী কথায় কথায় সুপ্রভার ঔদার্য্যের কথা তুলিয়া তাহাকে অপ্রতিভ করিবেন, আর সে, সমস্ত গ্লানি, সমস্ত অবমাননা নিঃশব্দে পরিপাক করিয়া জীবন ধারণ করিবে। পরিশোধ-অক্ষম সত্ত্বেও অনুৎপীড়িত রহিয়া সুপ্রভার প্রতি, দিনে দিনে অজিতের কৃতজ্ঞতা বাড়িয়া উঠিবে; আর সে তাহার পার্শ্বে তাহার নিরানন্দ অস্তিত্ব বহন করিয়া একটা জীবন্ত অপরাধের মত সসঙ্কোচে দিনাতিপাত করিবে! মনোরমার চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসিল, অভিমানে তাহার সমস্ত হৃদয়টা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল! এ জীবন লইয়া বাঁচিয়া কি সুখ?

৪

বেলা নয়টার সময় ডাক্তার কেলী আসিয়া মনোরমাকে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "পেটের ভিতর একটী নয়, অনেকগুলি ফোড়া হইয়াছে। অপারেশন না করিলে দু'দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।"

তাহার পর এই কঠিন অপারেশনের সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গেল। দুই

জন প্রথম শ্রেণীর সার্জ্জেন থাকিবে, তিন জন সাধারণ ডাক্তার, এক জন নার্স এবং তাহা ছাড়া ঔষধাদির ত কথাই নাই। মোটামুটি একটা হিসাবে দেখা গেল, সেই দিনই সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

ডাক্তার কেলী নীলমাধববাবুকে বলিলেন, "বৈকাল চার'টার সময় সকলের উপস্থিত হওয়া চাই; আর দ্রব্যাদি যেন তালিকামত প্রস্তুত থাকে।" অজিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবু, আমি সম্পূর্ণ ভরসা করি, তোমার স্ত্রী আরোগ্যলাভ করিবেন।"

ডাক্তারেরা প্রস্থান করিলে অজিত মাথায় হাত দিয়া বসিল। এত টাকার ব্যবস্থা কি করিয়া আর হইতে পারে? ডাক্তারেরা যখন ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন সে জড়পদার্থের মত নিশ্চল এবং নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল! সে কি বলিত! সে কেমন করিয়া ব্যবস্থায় বাধা দিত! কেমন করিয়া সে বলিত, মনোরমা মরে, মরুক, চিকিৎসায় কাজ নাই!

তাহার পর চারিটার সময় ডাক্তারগণ যখন আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন কি বলিয়া সে তাহাদিগকে ফিরাইবে! না ফিরাইলে, কেমন করিয়া সে তাহাদের ফি চুকাইবে!

এ কি মনোরমা, মরিবে বলিয়া কি তুমি বদ্ধপরিকর হইয়াছ? কোনরূপে কি তোমাকে ধরিয়া রাখা যাইবে না!

অজিত চিন্তায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এখন কি করা যাইবে, এখন কি উপায় আছে? পুনরায় কি সুপ্রভার নিকট অর্থ চাহিবে? না, কিছুতেই নহে; নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় আচরণ হয়। চাহিলেই যাহার নিকট পাওয়া যায়, সর্ব্বদা তাহার নিকট চাওয়া যায় না। সুপ্রভা মনে করিবে, ইহার লোভেরও শেষ নাই, অবিবেচনারও সীমা নাই! প্রথমেই যদি সে বেশী টাকা চাহিত, তাহা হইলেও কথা ছিল, এখন কিন্তু আর চাওয়া যায় না। তবে এখন কি করা যায়?

সহসা সুপ্রভার চেকখানা অজিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহার মধ্যে কেবলমাত্র সংখ্যায় লিখিত আছে ৫০০ টাকা, শব্দের দ্বারা লিখিত নাই। একটা উদ্দাম কল্পনা অজিতকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল! একটা শূন্য যোগ করিয়া ৫০০কে ৫০০০ করিলে কি হয়? প্রতারণা করা হয়! জাল করা হয়! জুয়াচুরি করা হয়! কিন্তু মনোরমার প্রাণ রক্ষা করিবার ত একটা উপায় হয়!

মতলবটা ক্রমশঃ অজিতকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। অপরাধ বটে! পাপ নিঃসন্দেহ! কিন্তু একটা জীবন রক্ষা করিবার জন্য এ পাপটুকু ক্ষমার্হ নহে কি? পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে যতটুকু মনোরমার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা লইয়া বাকি টাকা সুপ্রভাকে প্রত্যর্পণ করিবার সময় হাতে পায়ে ধরিয়া সুপ্রভার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইলেই চলিবে। উদার-হৃদয়া সুপ্রভা নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিবে।

টেবিলের উপর কলম এবং দোয়াত প্রস্তুত ছিল, কে যেন কলমটাকে অজিতের হস্তে তুলিয়া দিল, এবং কে যেন অজিতের হাত ধরিয়া কলমটা কালীর দোয়াতে ডুবাইয়া লইল! চক্ষের পলকে কি একটা হইয়া গেল। বিস্মিত অজিত চাহিয়া দেখিল,—পাঁচ শত টাকার চেক পাঁচ হাজারে পরিণত হইয়াছে!

তখন উন্মত্ততার মতই একটা কি, অজিতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছিল, আর তৃতীয় উপায় রহিল না! এখন হয় চেকখানা নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়, নহে ত জাল চেক ভাঙ্গাইতে ব্যাঙ্কে যাইতে হয়।

বেলা এগারটার সময় টলিতে টলিতে অজিতকুমার লিভারপুল ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গাইবার কামরার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কি একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়া যেন সে চলিতেছিল! কি একটা উত্তেজনার আবেশে সে যেন অধীর হইয়া উঠিতেছিল!

কম্পিতহস্তে অজিত চেকখানা কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করিল। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া চেকখানা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহার পর অজিতের মুখ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া বলিল, "এই নিন আপনার চাকৃতি; আপনি অনুগ্রহ ক'রে দু'মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আস্‌ছি।"

চেকখানা লইয়া কর্ম্মচারী ম্যানেজার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। ম্যানেজারের হস্তে চেকখানা প্রদান করিয়া বলিল, "চেকখানা একটু সন্দেহের ব'লে মনে হচ্ছে, পাঁচ হাজারের শেষের শূন্যটা যেন অন্য হাতের লেখা বলে মনে হয়; তা ছাড়া পাঁচ হাজার টাকাটা কথায় লেখা নেই।"

ম্যানেজার চেকখানা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। টাকাটা অমনই দেওয়া হবে না। চেক যে দিয়েছে, তাকে বল যে, এক ঘণ্টা পরে সে টাকা পাবে; ইত্যবসরে তুমি সুপ্রভা দেবীর বাড়ী গিয়ে চেকখানা দেখিয়ে নিয়ে এস।"

কর্ম্মচারী আসিয়া অজিতকে কহিল, "আপনার চেক ক্যাশ্ হ'তে প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হবে। অনুগ্রহ ক'রে এক ঘণ্টা পরে আস্‌বেন।"

অজিতের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এক ঘণ্টা বিলম্ব! তাহা হইলে ইহারা জাল করার কথা জানিতে পারিয়াছে নাকি? অজিতের দেহ হইতে যেন সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিল। এখন অদৃষ্টে কি নিগ্রহ-ভোগ আছে, কে জানে! হয় ত আর গৃহে ফিরিতে পারা যাইবে না, একেবারে হাজতে ধরিয়া লইয়া যাইবে! তাহার পর সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় তাহার কলঙ্কের কাহিনী ফুটিয়া উঠিয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে! আর উপায়হীনা মনোরমার পক্ষেও মৃত্যু ভিন্ন উপায়ান্তর থাকিবে না! টলিতে টলিতে অজিত ব্যাঙ্ক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অজিতের ভাব অবলোকন করিয়া কর্ম্মচারীর মনে সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইল। সে তখনই একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া সুপ্রভার গৃহে উপস্থিত হইল। একখণ্ড কাগজে লিখিল, "আমি লিভারপুল ব্যাঙ্ক হইতে আসিতেছি। আপনার সহিত একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে। বাধ্য হইয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে হইল, তজ্জন্য অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন!"

পত্রখানা লইয়া একজন ভৃত্য সুপ্রভার নিকট উপস্থিত হইল। পত্র পাঠ করিয়া সুপ্রভা কহিল, "বাবুকে এইখানে ডেকে নিয়ে আয়।"

কর্ম্মচারী প্রবেশ করিয়া বিনীতভাবে কহিল, "আপনাকে বিরক্ত কর্‌লাম, অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা কর্‌বেন। তবে বিষয়টা একটু গুরুতর ব'লে উপেক্ষা করা গেল না। দেখুন দেখি, এ চেকখানা কি ঠিক আছে?"

সুপ্রভা চেকখানা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কে এ চেকখানা আপনাদের ব্যাঙ্কে উপস্থিত করেছে?"

কর্ম্মচারী কহিল, "একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর হবে, রং ফরসা, চোখে সোণার চসমা, ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি—"

সুপ্রভা বলিল, "এ চেক ঠিকই আছে, কোন গোল নেই। আপনি আর বিলম্ব না ক'রে টাকাটা তাঁকে দেবেন। তাঁর টাকার অতি শীঘ্র প্রয়োজন।"

কর্ম্মচারী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, কিন্তু পাঁচ হাজারের শেষের শূন্যটা দেখে আমাদের মনে সন্দেহ হয়েছিল। তা ছাড়া পাঁচ হাজার শুধু সংখ্যায় লেখা আছে, কথায় লেখা নাই। সন্দেহের কারণ উপস্থিত হ'লে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, আপনাদের পরামর্শ নেওয়া।"

অবিচলিতভাবে সুপ্রভা কহিল, "আপনি ঠিকই করেছেন। শেষের শূন্যটা লেখ্‌বার সময় আমার হাত কোন কারণে বোধ হয় কেঁপে গিয়েছিল। আমি ঠিক ক'রে লিখে দিচ্ছি।"

সুপ্রভা চেকের উপর পরিচ্ছন্নভাবে লিখিয়া দিল,—পাঁচ হাজার টাকা।

কর্ম্মচারী ব্যাঙ্কে ফিরিয়া আসিল।

এক ঘণ্টা পরে অজিত মাতালের মত চেক ভাঙ্গাইবার কামরার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার জিহ্বা জড়াইয়া আসিতেছিল। "আমার টা-আ-কা!"

কর্ম্মচারী উঠিয়া ব্যস্তভাবে কহিল, "হ্যাঁ, আপনার টাকা নিন। চা'র খানায় চার হাজার, আর খুচরা এক হাজার।"

তাহার পর কতকটা ত্রুটি-স্খালনের মত সে কহিল, "আসল কথা কি জানেন?—আপনার চেকের পাঁচ হাজারের শেষের শূন্যটায় আমাদের একটু সন্দেহ হয়। আমি সেই জন্য চেকখানা সুপ্রভা দেবীকে দেখিয়ে আন্‌বার জন্য তাঁর বাড়ী গিয়েছিলাম। তাই টাকা পেতে আপনার বিলম্ব হ'ল। নচেৎ আমাদের ব্যাঙ্কে টাকা পেতে দেরী হয় না।"

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অজিত কহিল, "চেক দেখে তিনি কি বল্লেন?"

কর্ম্মচারী কহিল, "তিনি বল্লেন, চেক ঠিকই আছে। তার পর চেকের উপর ভাল ক'রে পাঁচ হাজার টাকা লিখে দিলেন। তবে আমাদের সন্দেহ যে অকারণ হয় নি, তা তাঁকে স্বীকার কর্‌তে হ'ল। তিনি বল্লেন, শেষের শূন্যটা লেখ্‌বার সময় বোধ হয় কেমন ক'রে তাঁর হাত কেঁপে গিয়ে থাক্‌বে। কোন প্রকার সন্দেহ হ'লে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা আমাদের কর্ত্তব্য। যাহোক মশায় এই বিলম্বটুকুর জন্য আমাদের ক্ষমা কর্‌বেন।"

নোটগুলা পকেটে পুরিয়া অজিত একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া গৃহে ফিরিল। একটা সকরুণ সঙ্গীত তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যাপিয়া ঝঙ্কারিত হইতেছিল! আছ, আছ, প্রভু, তুমিও আছ! মানুষের রূপ ধারণ করিয়া এ দুঃসহ সংসারের মধ্যে তুমিও আছ! কেবল পাওনাদার নাই, কেবলই উৎপীড়ক নাই! তুমিও আছ! তুমিও আছ! এই সুপ্রভার হৃদয়খানি তোমারই হৃদয়ের কণিকামাত্র! তুমি আছ, তুমি আছ!

গৃহে পৌঁছিয়া অজিত দেখিল, শান্তভাবে মনোরমা নিদ্রা যাইতেছে। অধর-প্রান্তে যেন একটু হাস্যের রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে।

অজিত মনে মনে ভাবিল, এখন আমি নিশ্চিন্ত! মনোরমা, এ পাঁচ হাজারের পাঁচ হাজারই আমি তোমার জন্য ব্যয় করিতে পারি! আর আমার লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই! ইহা ভগবানের দান! ইহাকে প্রত্যাখ্যান করাই পাপ!

গভীর স্নেহভরে নিদ্রিতা মনোরমাকে অজিত চুম্বন করিল।

কিন্তু একি! মনোরমার অধর যে বরফের মত শীতল! চকিত হইয়া অজিত মনোরমার বক্ষে হাত দিয়া দেখিল, স্পন্দন নাই! নাসিকায় হাত দিয়া দেখিল, নিঃশ্বাস নাই! অজিত উন্মত্তের মত ডাকিল, "মনোরমা!" কোন উত্তর নাই! শুধু অধর-প্রান্তের হাস্যকণাটুকু যেন আরও একটু স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল!

কলি ও কুসুম

১

রিপন কলেজে আইন পড়িতাম এবং দিবারাত্র একাগ্রচিত্তে কবিতা লিখিতাম। একজন মস্ত উদীয়মান কবি হইয়া উঠিতেছি বলিয়া বন্ধু-সমাজে কতকটা প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলাম এবং মনের মধ্যে ক্রমশঃ এমন একটা ধারণা জন্মগ্রহণ করিতেছিল যে, একদিন বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ কবির বিজয়-মুকুট আমার মস্তকে সুশোভিত হইবেই। শুধু বিশ্ব-জগতের সহিত একটু পরিচয় আবশ্যক। খনিমধ্যস্থ রত্নের মত প্রচ্ছন্ন থাকিলে আর যশের জ্যোতি আপনা-আপনি বিকীর্ণ হইবে না। স্থির করিলাম, সাধারণের দৃষ্টির সমক্ষে যেরূপেই হউক নিজকে উপস্থিত করিতে হইবে।

সংসারে রসজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান্ লোকই যে অল্প তাহার অন্যতম প্রমাণ, অধিকাংশ লোকই কবিতা ভালবাসে না, অর্থাৎ বুঝিতে পারে না! বন্ধুগণ আমাকে কবি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু আমার কবিতা পাঠ করিবার ধৈর্য্য তাহাদের অধিকাংশের—অধিকাংশের কেন, একজন ভিন্ন প্রায় কাহারও ছিল না। এই অরসিকগুলিকে সরস করিয়া তুলিবার জন্য আমার পক্ষ হইতে উদ্যম এবং অধ্যবসায়ের কোন অভাব দেখা যাইত না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মানুষকে নিম্নস্তর হইতে ঊর্দ্ধে তুলিয়া লওয়া এতই কঠিন ব্যাপার যে, আমার বন্ধুবর্গ তাস খেলা, গল্প করা, বেড়াইতে যাওয়া প্রভৃতি সামান্য এবং তুচ্ছ ব্যাপারে সহজেই তুষ্ট হইত, কিন্তু কবিতা পড়িতে তাহারা কোন মতেই স্বীকার হইত না।

এই অরসিকের দলে একটী মস্ত যে রসিক ব্যক্তি, তাহার নাম ছিল বীরেশ্বর দত্ত—আমারই সহপাঠী এবং সর্ব্ব বিষয়ে আমার অনুগত। যে কবিতা আমারও ভাল লাগিত না, বীরেশ্বর তাহারই মধ্য হইতে এমন অর্থ এবং সৌন্দর্য্যের সন্ধান বাহির করিত যে, আমি পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া যাইতাম। বীরেশ্বর কহিত, "ললিত দা', ফুল শুধু ফুটিয়াই নিরস্ত, আর কবি শুধু কবিতাই লিখিতে জানে, কিন্তু যে সমজদার, সেই তার মর্ম্ম বোঝে হে!" আমি মনে করিতাম,—হায়, সমজদারের সংখ্যা পৃথিবীতে যদি আরও কিছু অধিক হইত!

অবশেষে বিশ্ব-সংসারের সহিত আমার পরিচয় ঘটিতে আরম্ভ হইল। বাঙ্গালা মাসিক পত্রের কয়েকটীতে আমার কবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই পরমাশ্চর্য্য ঘটনার পর হইতে বন্ধুমহলে একজন বিশিষ্ট কবি বলিয়া আমার প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট বাড়িয়া গেল বটে—কিন্তু কবিতা পড়িবার আগ্রহ যে তাহাদের কিছু মাত্র বৃদ্ধি পায় নাই, তাহা আমাকে অকপটে স্বীকার করিতেই হইবে।

মাসিক পত্রে কবিতা প্রকাশিত হওয়ার আনন্দ এবং উত্তেজনা যখন অনেকটা কমিয়া আসিল, তখন এক দিন বীরেশ্বর আমার নিকট এক নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিল। সে কহিল, "মাসিক পত্রে কবিতা প্রকাশিত হইয়া যশ এবং পরিচয় ত যথেষ্ট হইয়াছে, এখন একটী স্বতন্ত্র কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত করা উচিত। তাহাতে যশ ত আসিবেই, যশের সহচর হইয়া অর্থেরও যথেষ্ট সমাগম হইবে।"

বীরেশ্বরের কথাটা 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল' গিয়া 'আকুল করিল মোর প্রাণ'। কারণ অর্থের অভাব তখন আমার প্রাণকে বাস্তবিকই আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। সেই অর্থ যদি যশের সহচর হইয়া দেখা দেন, তাহা হইলে ত মণিকাঞ্চনের সংযোগ! বীরেশ্বরের

সহিত সমস্ত প্ল্যান ঠিক করিয়া ফেলিলাম, এমন কি কবিতা-পুস্তকের নাম পর্য্যন্ত। নাম নির্দ্ধারণের সময় যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; কারণ বাঙ্গালা দেশের কবিগণ আর কিছু না করুন, সমস্ত শ্রুতি-কোমল নামগুলি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। অনেক চিন্তার পর স্থির লইল, আমার কাব্য-পুস্তকের নাম হইবে "কলি ও কুসুম"।

সমস্ত ব্যাপারই স্থির হইয়া গেল, বাকি রহিল শুধু পুস্তক ছাপাইবার ব্যবস্থা, অর্থাৎ সকল দুঃখই ঘুচিল, রহিল কেবল অন্নবস্ত্রের অভাব! বীরেশ্বর কিন্তু বলিল, ছাপাইবার ব্যবস্থার জন্য কোন চিন্তা নাই—অতি সহজে সে তার ব্যবস্থা করিয়া লইবে। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুধাকর সরকারের ভাগিনেয় হেমেন্দ্রনাথের সহিত বীরেশ্বরের পরিচয় ছিল। পরামর্শ হইল, বীরেশ্বর নিম্নলিখিতভাবে হেমেন্দ্রবাবুর নিকট পুস্তক মুদ্রণের প্রস্তাব করিবে।—'পুস্তক ছাপাইবার সমস্ত ব্যয় শ্রীযুক্ত সুধাকর সরকার বহন করিবেন। পরে বিক্রয়ের টাকা হইতে সুধাকরবাবু প্রথমে ছাপা-খরচ আদায় করিয়া লইবেন, তৎপরে যাহা আমদানি হইবে, তাহা শতকরা দশ টাকা কমিশন বাদে আমার প্রাপ্য হইবে। অথবা, প্রথমেই আমাকে নগদ চারি শত কিংবা পাঁচ শত টাকা দিয়া সুধাকর সরকার প্রথম সংস্করণ ছাপাইবার অধিকার গ্রহণ করিবেন, পরে ছয় মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ বিক্রয় করিতে না পারিলে ছয় মাস পরে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার ক্ষমতা আমাদের থাকিবে।' বীরেশ্বরের ব্যবস্থা আমার বেশ ভাল লাগিল; বিশেষতঃ দ্বিতীয় প্রস্তাবটি। এক সঙ্গে চা'র পাঁচ শত টাকা হাতে আসিলে মন্দ কি! তাহার পর ছয় মাস পরেই দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে পারিব। দ্বিতীয় প্রস্তাবেই যাহাতে সুধাকর সরকার স্বীকৃত হন, সে বিষয়ে চেষ্টা করিবার জন্য আমি বীরেশ্বরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলাম।

বীরেশ্বর সগর্ব্বে জানাইল, আমার মত সুকবির কবিতা-বহি ছাপাইবার এরূপ উদার প্রস্তাব সুধাকর সরকার সাগ্রহে বরণ করিয়া লইবে। তাহার জন্য চেষ্টা বা যত্নের কোন প্রয়োজন হইবে না।

বীরেশ্বর কহিল, "ললিত দা', একেবারেই সুধাকর সরকারকে বইখানা ছেড়ে দেব? আর কোন পাব্‌লিশারের কাছে দরটা দেখ্‌ব না?"

আমি কহিলাম, "নাঃ, বড় পাব্‌লিশারকে দেওয়াই ভাল; কি জানি টাকা-কড়ির কথা, দু'পয়সা কম হয় তাও ভাল।"

বীরেশ্বর কহিল, "তা বটে!"

২

পরদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বীরেশ্বর ও আমি সুধাকর সরকারের পুস্তকালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। 'কলি ও কুসুমের' পাণ্ডুলিপিখানি সঙ্গে লইলাম, এবং বিভিন্ন মাসিকে প্রকাশিত আমার কবিতাবলি সম্বন্ধে যে সকল অনুকূল সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, সেগুলিও লইতে ভুলিলাম না। পথে বাহির হইয়া আমার মনে হইতেছিল, বীরেশ্বরের দম্ভ ও বিশ্বাস যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার পর সুধাকর সরকারের দোকানে ঢুকিবার সময় বীরেশ্বরের উৎসাহহীন ম্লান মুখ দেখিয়া আমার চক্ষে প্রায় জল আসিয়াছিল।

সম্মুখেই দেখিলাম হেমেন্দ্রনাথ বসিয়া নানা কার্য্যে ব্যস্ত এবং পার্শ্বে কিয়দ্দূরে সুধাকরবাবু টাকা-কড়ি লইয়া বসিয়া আছেন।

বীরেশ্বরকে দেখিয়া হেমেন্দ্র বলিল, "কি হে? কি মনে ক'রে?"

বীরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল, "একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে;" বলিয়া সংক্ষেপে আমাদের শুভাগমনের কারণ বিবৃত করিল।

ধীরভাবে হেমেন্দ্র সকল কথা শুনিয়া কহিল, "এ ব্যাপার ত আমার হাতে না, চল; মামার কাছে তোমাদের পরিচয় ক'রে দিই, পরে আমি তোমাদের এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারি।"

সাহায্য করতে পারি! হেমেন্দ্রর কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। আমি দয়া করিয়া তাঁহার অর্থাগমের উপায় করিয়া দিতে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, আর তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন! উঃ কি ভয়ানক ব্যবসাদারী চাল! পাছে দর বেশী দিতে হয়!

হেমেন্দ্র আমাদের দু'জনকে লইয়া সুধাকরবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ইনি হচ্চেন শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর দত্ত, আমার একজন বন্ধু, ল পড়েন; আর ইনি হচ্চেন শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু, ইনি একজন কবি, একটা কবিতা-পুস্তক রচনা করেছেন, সেটা ছাপাতে চান এবং আমাদের প্রকাশক করতে চান;" পরে বীরেশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিল, "বীরেশ্বর, তুমি সব কথা বল, আমি একটু ব্যস্ত আছি;" বলিয়া হেমেন্দ্র পূর্ব্বস্থানে গিয়া বসিল।

বীরেশ্বর কোনপ্রকারে অসংলগ্নভাবে আমাদের বক্তব্যটা প্রকাশ করিল। বলিবার ভঙ্গীটা মোটেই সুবিধামত হইল না, আমারই নিকট তাহা কিছুমাত্র চিত্তাকর্ষক বলিয়া বোধ হইল না। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় প্রস্তাবটা বলিবার সময় চারি পাঁচ শত টাকা বলিবার স্থলে ইতস্ততঃ করিয়া বীরেশ্বর তিন চারি শত বলিয়া ফেলিল। এক মুহূর্ত্তের ভুলে এক শত টাকা দর কমিয়া যাওয়ায় আমার মনে অতিশয় ক্ষোভ হইল।

সমস্ত শুনিয়া সুধাকরবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কবিতার বই আমরা ছাপাই না ত। বাঙ্গালা দেশের যাঁরা বড় কবি তাঁদেরই বই

বিক্রি হয় না, তা নূতন কবির বই কে কিন্‌বে বলুন ? দশ টাকা কমিশনের কথা বল্‌ছেন, কবিতার বইয়ে ত্রিশ টাকা কমিশন নিয়ে বিক্রি হবার জন্য লেখকরা সাধাসাধি করেন—তাই বিক্রি হয় না। কবিতার বই ছাপান কি জানেন, ও একটা অনেক পয়সার সখ! তাতে গ্রন্থকার হওয়া যায়—কিন্তু বড়লোক হওয়া যায় না। কবিতার বই ছাপিয়ে যেমন বড় লোক হওয়া যায় না, তেমনি বড় লোক না হ'লে কবিতার বই ছাপান যায় না। বই ছাপাবার খরচ, বিজ্ঞাপন খরচ, নানা প্রকার খরচ আছে, অথচ আমদানি এক পয়সা নেই। ছাপান ত দূরের কথা, কবিতার বই দু'পাঁচখানার বেশী আমরা দোকানে রাখ্‌তেই চাইনে, ও যেন ভূতের বোঝা বওয়া ;" বলিয়া সুধাকরবাবু মুরুব্বিয়ানা-ভাবে হাসিতে লাগিলেন।

শুনিয়া আমাদের বুক সাত হাত দমিয়া গেল। বীরেশ্বর একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখের অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিল।

বীরেশ্বর ক্ষীণস্বরে কহিল, "এঁর কবিতার খুব ভাল সমালোচনা অনেক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েচে।"

সুধাকরবাবু কহিলেন, "এঁর বই বেরুলে তেমনি ভাল সমালোচনা প্রকাশিত হবে, অথচ বই বিক্রয় হবে না। আপনারা জানেন না, মন্দ বইয়ের চেয়ে ভাল বই ঢের কম বিক্রি হয়। বহুদিন ধ'রে এই ব্যবসা ক'রে আমার একটু অভিজ্ঞতা হওয়া আশ্চর্য্য নয় ত। আমার কথা শুনুন, খরচপত্র করে কবিতার বই ছাপাবেন না। আপনারা যখন হেমের বন্ধু, তখন আমি কোন মতেই অন্য রকম পরামর্শ দিতে পারি না। কবিতা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হওয়াই ভাল; তাতে পয়সা খরচ হয় না, অথচ একটু যশলাভও হয়।"

বীরেশ্বর কহিল, "তা হ'লে আপনারা কি আমাদের বই ছাপাতে অস্বীকৃত ?"

সুধাকরবাবু সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "নিতান্তই! তবে—আপনারা যদি ছাপাতে একান্তই নিরস্ত না হন, তা হ'লে পাঁচ কপির বেশী আমাদের দোকানে দেবেন না। বুড়োমানুষের আর একটা কথা মনে রাখ্‌বেন, বই ছাপাবার আনন্দের যা পরিমাণ, বই বিক্রয় না হওয়ার মনকষ্ট ঠিক তার দশগুণ! বাঙ্গালা দেশের কবিরা বারংবার তাঁদের পুস্তকের খবর নিতে এসে যখন বিষণ্ণ মনে ফিরে যান, তখন মনে হয়, তাঁদের আর সত্যি কথা বল্‌ব না!"

উঃ, কি সহজ সরলভাবে অপ্রিয় সত্য জ্ঞাপন! হেমেন্দ্রের সহিত চোখোচোখী না করিয়া দু'জনে প্রায় ঠেলাঠেলী করিতে করিতে ফুট-পাথে আসিয়া পড়িলাম। বহুদিনের কল্পিত আকাশ-প্রাসাদ একমুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইল।

আমি যতক্ষণ মনে মনে পর্য্যাপ্তপরিমাণে নিরাশা-সাগরের বারিপান করিতেছিলাম, রাজপথের খোলা-হাওয়া খাইয়া বীরেশ্বর ততক্ষণে কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া উঠিয়াছিল।

সে কহিল, "আসল ব্যাপারটা কি বুঝ্‌তে পার্‌লে ললিত দা' ?"

আসল ব্যাপার আমি খুব স্পষ্টভাবেই বুঝিয়াছিলাম, তথাপি বীরেশ্বরের বক্তব্য শুনিবার অভিপ্রায়ে কহিলাম, "কি বল দেখি ?"

বীরেশ্বর কহিল, "বই ঠিক ছাপাবে। এ সুধু দর কষাকষি। চা'র শ' টাকা বলেছি, তিন শ' টাকা বল্‌লে এখনি নেবে।"

আমার কিন্তু সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ ছিল এবং অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে, জানি না কেন, বীরেশ্বরের উপর আমি ঈষৎ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কহিলাম, "তা বল্‌লে না কেন।"

বীরেশ্বর দর্পভরে কহিল, "ক্ষেপেছ ললিত দা', আমি কি তেম্নি কাঁচা ছেলে যে, পাঁচ জায়গায় দর না দেখে অম্নি সস্তা দরে ছেড়ে দেব! দেখনা, আজই আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি;" বলিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া সে অন্য একটা পুস্তকাগারে ঢুকিল। প্রবেশ করিবার সময় আমি চাহিয়া দেখিলাম, সাইনবোর্ডে লেখা রহিয়াছে বীণাপাণি লাইব্রেরী। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কিন্তু তথা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। তাহার পরে "বান্ধব পুস্তকালয়ে" প্রবেশ করিলাম, তাহার পর "চ্যাটার্জ্জী ব্যানার্জ্জী কোম্পানী," তৎপরে "গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি," তৎপরে "আদর্শ পুস্তকালয়," তাহার পর আরও চারি পাঁচটি পুস্তকালয়—সে গুলির নাম এখন আর মনে নাই।

অবশেষে যখন বীরেশ্বর আর একটা পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল, তখন আমি বিদ্রোহী হইয়া উঠিলাম এবং যদিও বীরেশ্বরকে একটি অখণ্ড 'নিরেট' বলিয়া মনে মনে স্থির করিতেছিলাম, দেখিলাম, তাহারও ধৈর্য্য সীমায় উপনীত হইয়াছিল; অতি সহজেই সেও নিরস্ত হইল।

কলিকাতার পথে গ্যাস জ্বলিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেমন একটা ধূসর নিরানন্দ মলিনতা প্রকাশ হইয়া উঠে, হৃদয়ের মধ্যে ঠিক তেমনি একটা অপ্রসন্নতা বহন করিয়া সন্ধ্যার সময় শ্রান্তদেহে অবসন্নমনে মেসে ফিরিয়া আসিলাম।

৩

তিন চারি দিন বীরেশ্বর আমার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিত, আহারের সময় এবং শয়নের সময়েই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত। আমি মনে করিতাম, বহি ছাপাইতে নিষ্ফল হওয়ায় তাহার মনে লজ্জা হইয়াছে।

এক দিন অপরাহ্নে ভাল ছেলের মত পাঠে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় কোথা হইতে রৌদ্রদগ্ধ হইয়া বীরেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমি কহিলাম, "কি হে, তোমার যে আর টিকি দেখ্‌বার যো নেই!"

বীরেশ্বর রুমাল দিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া উত্তেজিতস্বরে কহিল, "ললিত দা', বই ছাপাবার সমস্ত ব্যবস্থা স্থির হ'য়ে গেছে, শীগ্‌গির আমার সঙ্গে 'কলি ও কুসুমের' খাতাখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়!"

আমি ধীরভাবে কহিলাম, "একবার বোকার মত কাজ করেছি ব'লে মনে করো না বারংবার কর্‌ব। তোমার সখ হ'য়ে থাকে ত খাতখানা নিয়ে যাও, তোমার নামে ছাপাওগে। ছাপান হ'লে একখানা আমাকে উপহার দিয়ো;" বলিয়া একখানা বহির পাতা খুলিয়া অসাধারণ গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহাতে মনোযোগ দিলাম।

বীরেশ্বর বহিখানা আমার হাত হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ওঠ ওঠ, মিছে দেরী করো না। এক মাসের মধ্যে তোমার বই যদি ছাপা না হয়, তা হ'লে আমার আর মুখ-দর্শন করো না! এবার আর দয়া নয়, কৃপাভিক্ষা নয়, এবার অনুগ্রহ ক'রে বই ছাপাব এবং দয়া ক'রে বইওয়ালাদের দোকানে বিক্রয় কর্‌তে দেব! বইওয়ালারা যে বলে যে, বাঙ্গালা দেশে কবিতার বই বিক্রি হয় না, 'কলি ও কুসুম' দিয়ে সে কথা যদি মিথ্যে কর্‌তে না পারি, তা হ'লে আমাকে আর বীরেশ্বর ব'লে ডেকো না, কাপুরুষেশ্বর ব'লে ডেকো! এই দেখ, এই কাগজে বই ছাপা হবে—আর এই কাগজে মলাট হবে;" বলিয়া একটা সাদা ও একটা রঙ্গীন কাগজের টুকরা আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

বীরেশ্বরের দৃঢ় ভঙ্গী ও অসাধারণ উগ্রতা দেখিয়া আমি বিস্মিত এবং ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, ক্রোধে এবং খর রৌদ্রে তাহার মুখ হাইল্যাণ্ডার গোরার মুখের মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল। আর আপত্তি করিলে পাছে আমার দেহের উপর শারীরিক বল প্রয়োগ করিয়া বসে, সেই আশঙ্কায় আর আপত্তি করিলাম না। শুধু তাহাই নহে, এই কয়েক দিন আমারও অন্তরে অপমানের একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা দিবানিশি নির্ম্মমভাবে বিঁধিতেছিল। কোনপ্রকারে যদি পুস্তক ছাপাইবার একটা ব্যবস্থা হয়, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না।

পথে বাহির হইয়াও বীরেশ্বর আমাকে তাহার বন্দোবস্তের কথা খুলিয়া বলিল না। অবশেষে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পথ হাঁটিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইয়া একটা প্রেসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একটি ভদ্রলোক চেয়ার, টেবিল লইয়া বসিয়াছিলেন; মনে হইল, তিনি প্রেসের ম্যানেজার, তাঁহাকে বীরেশ্বর কহিল, "ইনিই কবি শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু বি-এ;" 'কলি ও কুসুমের' পাণ্ডুলিপিখানি তাঁহার হাতে দিয়া কহিল, "এই বই ছাপা হবে।" তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "ইনি শ্রীযুক্ত ভজহরি চট্টোপাধ্যায়, প্রেসের সত্বাধিকারী।"

ভজহরিবাবু আমাকে যেরূপ অভ্যর্থনা এবং আপ্যায়িত করিলেন, তাহা একজন শ্রেষ্ঠ কবিরই উপযুক্ত। সুশীতল সরবৎ পান করিয়া সুগন্ধি তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে হৃদয়ের মধ্যে আমি যে একটা স্নিগ্ধ গৌরব উপলব্ধি করিতে লাগিলাম, কলেজষ্ট্রীটের পুস্তকের দোকানগুলাতে তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই!

তাহার পর কাজের কথা আরম্ভ হইল। বীরেশ্বর আমাকে কহিল, "কাগজের মূল্য বাবৎ এক শ' টাকা এঁদের দিন তিন চা'রের মধ্যে দিতে

হবে ; ইত্যবসরে এঁরা একেবারে দুই ফর্ম্মা কম্পোজ ক'রে রাখ্‌বেন ; পরে, এক মাস পরে যখন বই তৈয়ের হবে তখন ৭৫৲ টাকা দিয়ে আমরা হাজার বই নেব ও বাকি ৭৫৲ টাকা বই নেওয়ার এক মাস পরে আমরা দিয়ে দেব। কি বলেন ভজহরিবাবু, এই ত ?"

ভজহরিবাবু মাথা নাড়িয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞা—হঁ্যা, এই বই কি।"

ভজহরিবাবু যতই মাথা নাড়ুন, আমি কিন্তু ঘামিয়া উঠিয়াছিলাম। সর্ব্বনাশ ! এই আড়াই শত টাকার ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে কেমন করিয়া। বীরেশ্বরের কাণে কাণে কহিলাম, "টাকার ব্যবস্থা কেমন ক'রে হবে ?"

বীরেশ্বর চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া আমার কাণে কাণে কহিল, "চুপ ! ও সব কথা ব'লে খেলো হয়ো না, আমি কি সে ব্যবস্থা না ক'রে এঁর সঙ্গে কথা করেছি ?"

চুপ করিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিলাম। একবার ভাবিলাম, ভজহরিবাবুর নিকট হইতে খাতাখানা চাহিয়া লইয়া বলি দিন দুই পরে দিয়া যাইব। কিন্তু ভজহরিবাবুর আদর এবং অভ্যর্থনার মধ্যে এমন একটুও ফাঁক ছিল না, যাহার মধ্য দিয়া খাতাখানি উদ্ধার করিয়া কোন প্রকারে বহির্গত হওয়া যায় !

যে ভদ্র ব্যক্তিটি শীতল সরবৎ, মিঠা পান এবং মিষ্ট বাক্যের দ্বারা আমার পূজা করিতেছিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা আমার কবিতা-পুস্তক ছাপাইবার পক্ষে যাহার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না, তাঁহার নিকট হইতে খাতা ফিরাইয়া চাওয়ার মত রূঢ় আচরণ আর কি হইতে পারে !

পথে বাহির হইয়াই আমি বীরেশ্বরকে চাপিয়া ধরিলাম—"এই আড়াই শ' টাকার ব্যবস্থা কেমন ক'রে কর্‌বে বল ? আমার হাতে ত আড়াইটা টাকাও নেই ! শীঘ্র বল, তুমি কি ব্যবস্থা করেছ !"

বীরেশ্বর উচ্চহাস্ত করিয়া কহিল, "তুমি দেখ্‌ছি অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে পড়েছ! এইটুকু জেনে রেখ, চিন্তার কোন কারণ নেই, পরন্তু আমি প্রেসে এক শ' টাকা দেবই।"

আমি কহিলাম, "তোমার ছেলেমানুষী আমার সব সময় ভাল লাগে না; তুমি সব কথা খুলে যদি না বল ত এখনি প্রেসে গিয়ে আমি খাতা ফিরিয়ে আন্‌ব।"

বীরেশ্বর আমার দৃঢ়ভাব দেখিয়া কহিল, "নিতান্তই যখন তুমি নাছোড়বন্দ তখন আমার মতলব শোন। আমার বউদিদি এক ছড়া হার পাঠিয়েছেন ভেঙ্গে চুড়ী কর্‌বার জন্য। আপাততঃ আমি এক শ' টাকা কাগজের দাম দেব। বউদিদির চুড়ী স্যাক্‌রার দুর্নাম দিয়ে পূজোর ছুটীর আগে কোনপ্রকারেই হ'য়ে উঠ্‌বে না। পরে বইয়ের দাম থেকে হার ছাড়িয়ে পূজোর আগে চুড়ী ক'রে নেব। বই নেবার সময় ৭৫৲ টাকা দিতে হবে, সেটা অবশ্য কোনরকম ক'রে ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। একমাস পরে যে ৭৫৲ টাকা দিতে হবে তার জন্য ভাবিনে, সে বই বিক্রয়ের টাকা থেকেই দিয়ে দেব। তুমি অমন ক'রে তাকিয়ো না ললিত দা', তোমার কোন ভয় নেই! এ আমি ঠিক ক'রে নেব।"

বীরেশ্বরের কথা শুনিয়া আমার চক্ষু স্থির হইল! ইহার নাম বন্দোবস্ত! এক শত টাকা জুয়াচুরি করিয়া সংগ্রহ, আর বাকি দেড় শত টাকা আকাশ-কুসুম! আমি দৃঢ়ভাবে বীরেশ্বরকে কহিলাম, "তোমার গাঁজাখুরীর সহিত আমি নিজেকে জড়াতে চাইনে; তুমি যদি আমার খাতা ফিরিয়ে না আন তা হ'লে বন্ধু-বিচ্ছেদ হবে!"

বীরেশ্বর রাগিয়া উঠিয়া কহিল, "বন্ধু-বিচ্ছেদ হয় হবে, কিন্তু বই আমি ছাপাবই। তোমার মন কেমন জানি না ললিত দা', কিন্তু যেদিন থেকে বইওয়ালাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, সেদিন থেকে আমার মনে

অপমানের আগুন জ্বল্‌ছে। 'কলি ও কুসুম' ছাপিয়ে ছ' মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ বা'র কর্‌ব—তবে আমি ঠাণ্ডা হব। সহজ উপায়ে যদি না পারি ত কৌশলে কর্‌ব। তা যদি না পারি ত তুমি আমাকে গাধা ব'লে ডেকো!"

বীরেশ্বরের কথা শুনিয়া দুঃখের উপরেও হাসি পাইল। কহিলাম, "সে জন্য তোমার দুঃখের কোন কারণ নেই, কয়েক দিন থেকেই আমি তোমাকে মনে মনে গাধা ব'লে ডাক্‌চি। তুমিও যদি আমাকে গাধা ব'লে ডাক, আমি তাতে আর আপত্তি কর্‌তে পারিনে।"

বীরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "তাই যদি, তবে এস, দু'জনে পরস্পরকে পিঠে ঘোড়া ক'রে তুলি। বই ছাপান না হ'লেই, জেনো, আমরা দু'জনেই গাধা হ'য়ে থাক্‌ব।"

বীরেশ্বরকে কোনমতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া মেসে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিনই হার বন্ধক রাখিয়া প্রেসে এক শত টাকা দেওয়া হইল; এবং পরে দেড় শত টাকা যেরূপ ভাবে দেওয়া হইবে, তাহা ভজহরিবাবু অতিশয় ভদ্রতার সহিত আমাদের নিকট হইতে লিখাইয়া লইলেন।

মেসে ফিরিবার সময় আমি বীরেশ্বরকে কহিলাম, "তোমার বউদিদির হারের জন্যে আমার মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। ও কাজটা অতিশয় গর্হিত হয়েছে।"

বীরেশ্বর কহিল, "পুজোর সময় বউদিদি যদি চুড়ী না পান, তা হ'লেই গর্হিত হবে, নচেৎ না।"

৪

প্রায় কুড়ি দিন পরে প্রেসের দ্বারবান্ একখানি পত্র লইয়া আসিল, "বহি দফ্‌তরির বাটী হইতে আসিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবেন। দ্বারবানের সহিত ৭৫৲ টাকার রসিদ পাঠাইলাম, দয়া করিয়া ৭৫৲ টাকা দ্বারবানের হাতে দিয়া রসিদপত্রখানি নিজের কাছে রাখিবেন।"

পত্র পাঠ করার পর দ্বারবান্ তাহার ব্যাগ হইতে একখানি চক্‌চকে রঙ্গীন বহি বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। মলাটের উপরে বড় বড় করিয়া লেখা 'কলি ও কুসুম,' নীচে ছোট অক্ষরে 'শ্রীললিতমোহন বসু,' সর্ব্বশেষে মূল্য এক টাকা মাত্র।

বন্ধ্যা নারী দৈব ঔষধের গুণে পুত্রমুখ প্রথম সন্দর্শনে যেরূপ পুলকিত হয়, আমি তদপেক্ষা অধিক উল্লসিত হইয়াছিলাম।

ওরে, আমার বড় সুখের, বড় দুঃখের সামগ্রী! আমার অপমান-বিস্ফোটকের স্নিগ্ধ প্রলেপ! আমার কাব্য-জীবনের বিজয়-মুকুট! বহিখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া কোন প্রকারেই আমার সাধ মিটিতেছিল না। মনে হইতেছিল, জীবন-তরণী যেন সার্থকতার দ্বীপে আসিয়া ভিড়িল, তখন যেন মরিলেও আর দুঃখ ছিল না।

দ্বারবান্ রসিদখানা আমার হাতে দিল।

আমি তাহাকে বলিলাম, "অপর বাবুটি বাড়ীতে উপস্থিত নাই, পরদিন আমরা টাকা লইয়া গিয়া বহি লইয়া আসিব।" তদ্মর্ম্মে ভজহরিবাবুকে পত্রও লিখিয়া দিলাম।

বীরেশ্বর আসিলেই তাহার সম্মুখে বইখানা ধরিলাম। প্রথম পৃষ্ঠায়

লিখিয়া দিয়াছিলাম, "স্নেহের বীরুকে ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত হইল।"

বহি দেখিয়া কিন্তু বীরেশ্বরের মুখ শুখাইয়া গেল। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে কহিল, "অ্যাঁ, বই তৈয়ের হ'য়ে গিয়েছে? টাকার ব্যবস্থা ত কিছু হয় নি! আমি ভেবেছিলাম, এখনও দিনদশেক সময় পাব।"

আমাকে কিন্তু তখন যেন একটা নেশায় উত্তেজিত করিতেছিল। বহি তৈয়ার হইয়া প্রেসে পড়িয়া থাকিবে, ঘরে আসিবে না! বীরেশ্বরকে কহিলাম, "দেখ বীরু, আমাদের গ্রামের একজন ভদ্রলোক আমাকে ত্রিশ টাকা পাঠিয়েছিলেন তাঁকে কয়েকটা জিনিষ কিনে পাঠাবার জন্য। তার পর কাল তাঁর চিঠি পেয়েছি, তিনি লিখ্‌ছেন, মাসখানেকের মধ্যে তিনি নিজে আস্‌বেন, তখন জিনিষ কেনা হবে, টাকা আমার কাছে রাখ্‌তে বলেছেন। সে টাকা উপস্থিত নিতে কি সাহস করা যায়?"

বীরেশ্বর কহিল, "নিশ্চয়ই করা যায়। আমি পনের দিনের মধ্যে সব টাকা শোধ ক'রে দেব। তার পর বাকি ৪৫৲ টাকা চাই। বিজ্ঞাপন হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতির জন্য আরও টাকা পনের বেশী চাই। অর্থাৎ আরও ষাট টাকা জোগাড় কর্‌তে হবে।"

মেসের বন্ধুগণের নিকট হইতে আমি টাকা ত্রিশ ঋণ করিলাম; এবং ধৌত করিবার জন্য বীরেশ্বর তাহার যে শাল কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছিল, সেটা বন্ধক রাখিয়া কোথা হইতে সে ত্রিশ টাকা লইয়া আসিল।

টাকা ত কোনপ্রকারে জোগাড় হইল, তখন আমি ও বীরেশ্বর বহি আনিতে প্রেসে গমন করিলাম। ভজহরিবাবুর অকৃত্রিম আদর-অভ্যর্থনায় পরিতৃপ্ত হইয়া জনদশেক মুটিয়ার মাথায় এক সহস্র বহি চাপাইয়া মেসে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমি ও বীরেশ্বর যে কক্ষটিতে

থাকিতাম, সেটি প্রায় সমস্তই 'কলি ও কুসুমে' ভরিয়া গেল। তাহারই একপার্শ্বে বীরেশ্বর কোনরূপে আমাদের শয়নের একটু স্থান করিয়া লইল।

৫

পরদিন সকাল সকাল আহারাদি করিয়া বীরেশ্বর দোকানে দোকানে বহি দিতে চলিয়া গেল। আমার ইচ্ছা ছিল আমিও তাহার সঙ্গে যাই। কিন্তু বীরেশ্বরেরর মত হইল না, কহিল, "না, তোমার সম্মান তাতে নষ্ট হবে। দোকানদাররা এমন সৌভাগ্য করে নি যাতে তারা দোকানে ব'সে তোমার দর্শন পাবে।"

পাঁচ শত বহি বীরেশ্বর লইয়া গেল। বাকি পাঁচ শত বহির দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া আমি শুইয়া রহিলাম। ইহারাই আমার সৌভাগ্যের দূত, ইহারাই আমার যশের প্রবর্ত্তক, ইহারাই আমাকে অর্থের সিংহদ্বারে উপস্থাপিত করিবে!

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে দেখিলাম, গলির মোড়ে বীরেশ্বর আসিতেছে এবং তাহার পশ্চাতে চারিজন মুটে বহি লইয়া আসিতেছে।

বীরেশ্বর নিঃশব্দে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিলাম, তাহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। মুটের মাথা হইতে বহি নামাইয়া লইয়া, তাহাদিগকে পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া, একটা ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া বীরেশ্বর একটা পাখা লইয়া সবেগে হাওয়া খাইতে লাগিল।

তখন আমি সভয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে, বই ফিরিয়ে আন্‌লে যে?"

পাখাটা সজোরে নিক্ষেপ করিয়া বীরেশ্বর কহিল, "আরে ছিঃ ছিঃ! দোকানদারগুলার উপর ঘৃণা হ'য়ে গেল। সবটাতেই ষড়যন্ত্র, নিজেদের

প্রকাশিত বই ভিন্ন কেউ বিক্রি করিতে চায় না। পাঁচটা দোকানে দশখানা ক'রে দিয়ে এসেছি, আর সুধাকর সরকারের দোকানে হেমেন্দ্রকে অনেক ব'লে ক'য়ে একশ'খানা গছিয়েছি। কুড়িখানার বেশী নিতেই চায় না, বলে, যায়গা হবে না।" সহসা বীরেশ্বরের মুখ হাস্যোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কহিল, "ললিত দা', পাঁচ শ' টাকাই বল আর আট শ' টাকাই বল, তোমার সমস্ত বই সুধাকর সরকার এখনি কিনে নিতে রাজি আছে, যদি একটা সর্ত্তে রাজি হও!"

আমি কহিলাম, "কি সর্ত্ত?"

বীরেশ্বর সহাস্যে কহিল, "সুধাকরবাবুর একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে, যদি তাকে বিয়ে কর্‌তে স্বীকার হও। হেমেন্দ্র আমাকে বিশেষভাবে চেপে ধরেছিল, সুধাকরবাবুও তোমার সমস্ত সংবাদ আমার কাছ থেকে নিলেন; এ যদি কর, তা হ'লে আজই বই বিক্রি হয়ে যায়। কি বল, রাজি আছ? মেয়েটি কিন্তু খুব কালো শুনেছি।"

আমি গম্ভীর হইয়া কহিলাম, "আমি ত বই ছাপিয়েছি ব'লে ক্ষেপি নি! হাজারখানা বই জ্বালিয়ে দেব তাও স্বীকার, কিন্তু নিজের principleকে জলাঞ্জলি দেব না। আমার মত সঙ্গতিহীন লোকের উপার্জ্জনক্ষম না হ'য়ে বিয়ে করা ত একটা মহাপাপ! তার পর পছন্দর দিক থেকে দেখ্‌লে ত তোমার কথায় কিছুমাত্র উৎসুক হবার কারণ নেই!"

বীরেশ্বর কহিল, "রামঃ! আমিও তাদের হবে না ব'লে এসেছি। তুমি দেখ না ললিত দা', এমন হাণ্ডবিল ছাড়্‌ব আর বিজ্ঞাপন দেব যে, তোমার বই হুড়হুড় ক'রে বিক্রয় হবে।"

পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া প্রায় আহার-নিদ্রা বন্ধ করিয়া বীরেশ্বর হাণ্ডবিল বিলি করা, বিজ্ঞাপন দেওয়া, সমালোচনা বাহির করা প্রভৃতি কার্য্যে

সমস্ত কলিকাতা সহর ঘুরিয়া বেড়াইল। দৈনিক ও সাপ্তাহিক ইংরাজী, বাঙ্গালা, অনেক সংবাদপত্রে আমার কবিতা-পুস্তকের সুখ্যাতি বাহির হইয়া গেল; অর্থাৎ পুস্তক বিক্রয় করাইবার জন্য, যতকিছু কৌশল এবং উপায় করা যাইতে পারে তাহার কিছুই বাকি রহিল না।

কিন্তু পনের দিন পরে যখন বীরেশ্বর সংবাদ লইয়া আসিল, তখন তাহার কথা শুনিয়া আমার চক্ষু স্থির হইল! দেড় শত বহির মধ্যে মাত্র একখানি বিক্রয় হইয়াছে! তাহাও হেমেন্দ্র কলিকাতার একটি প্রধান লাইব্রেরীর অধ্যক্ষকে কতকটা জোর করিয়া গছাইয়া দিয়াছে। বিজ্ঞাপন ও হ্যাণ্ডবিলে পঁচিশ টাকা খরচ হইয়াছে, তাহার মধ্যে কত প্রলোভন দেখান হইয়াছে, কিন্তু চা'র কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে একজনেরও মন টলিল না। পাপে, অত্যাচারে, দুষ্কর্ম্মে প্রত্যহ হাজার হাজার টাকা নষ্ট হইতেছে, কিন্তু একটি টাকা ব্যয় করিয়া কাব্য উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি একটি লোকেরও নাই! পথে লোক চলাচল করিতেছিল; আমার ইচ্ছা হইতেছিল, জানালায় দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রতি অজস্র গালি-বর্ষণ করি! হতভাগারা—কি আর বলিব? মনের আক্রোশে জ্বলিতে লাগিলাম!

মেসের যাহাদের নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলাম, তাহারা কয়েক দিন হইতে টাকা চাহিতেছে; দশ বার দিন পরে ভজহরিবাবুকে ৭৫৲ টাকা দিতে হইবে, গ্রামের যে লোকটির ত্রিশ টাকা খরচ করিয়া রাখিয়াছি, তিনি চিঠি লিখিয়াছেন, কয়েক দিনের মধ্যে আসিতেছেন; তাহার পর হার ছাড়ান, শাল ছাড়ান, এ সকল ত আছেই! দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিলাম। মাসিকপত্রে কবিতা বাহির হইত, তাহাতে তৃপ্তি ছিল, সমাদর ছিল, অথচ পয়সা খরচ এবং দুর্ভাবনা ছিল না। বেশ ছিলাম! দরিদ্র ব্যক্তির এ অশ্বপীড়ার কি প্রয়োজন ছিল!

বীরেশ্বরের উপর অতিশয় রাগ হইল। উদ্দেশ্য তাহার যতই সাধু হউক, সেই এই বিপদটি ঘটাইয়াছে। তাহাকে কহিলাম—

"এখন উপায়? ধার শুধ্‌বে কেমন ক'রে?"

মাথা চুলকাইয়া, ইতস্ততঃ করিয়া বীরেশ্বর কহিল, "সে আমি কোন রকম ক'রে ব্যবস্থা কর্‌ব এখন; ললিত দা', তারা আজ আবার সেই কথা তুলেছিল।"

আমি সক্রোধে কহিলাম, "কারা? কি কথা?"

"হেমেন্দ্র তোমার বিয়ের কথা বল্‌ছিল। বল্‌ছিল, তা হ'লে তারা আট শ' টাকা দিয়ে সমস্ত বই কিনে নিতে পারে।"

আমি জ্বলিয়া উঠিলাম—কহিলাম, "তোমার মনে বুঝি এই মতলব ছিল, বই বিক্রয় কর্‌বে আমার ঘাড়ে একটা ধেড়ে কাল মেয়ে চাপিয়ে! আমি জেলে যাব, বিরাগী হ'য়ে যাব, তবু তা কর্‌ব না।"

বীরেশ্বর হাসিয়া ফেলিল—কহিল, "বিরাগী হ'য়ে কাজ নেই, বিয়ে তুমি করো না। তারা বল্‌ছিল, সেই কথাটা তোমাকে জানালাম। কিন্তু বই বিক্রির জন্য তোমার চিন্তার প্রয়োজন নেই। তোমাকে বলাই ত আছে, বই বা'র হবার এক মাসের মধ্যে সমস্ত বই বিক্রি না হ'লে আমাকে গাধা ব'লে ডাক্‌বে। সহজভাবে এতদিন দেখ্‌লাম, এইবার বিষবড়ি প্রয়োগ কর্‌ব। জান ত কবিরাজরা সব শেষ ক'রে তার পর বিষবড়ি দেয়। আমার প্ল্যান শোন,—এবার শাঠ্য, এবার প্রতিশোধ,—বাঙ্গালা দেশের উপর, বাঙ্গালী বইওয়ালাদের উপর! আরও এক শ' টাকা খরচ কর্‌ব, টাকা মজুত আছে। কল্‌কাতায় আমাদের যত বন্ধু আছে, সকলকে একটি ক'রে টাকা দেব, তারা সেই টাকা দিয়ে সুধাকর সরকারের দোকানে গিয়ে 'কলি ও কুসুম' কিনে আন্‌বে। মফস্বলে বন্ধুদের কাছে টাকা পাঠিয়ে দেব, তারা মণিঅর্ডারে টাকা

পাঠিয়ে দিয়ে সুধাকরবাবুর দোকান থেকে 'কলি ও কুসুম' আন্‌বে। দিন দশ-বারর মধ্যে এই উপায়ে আশী নব্বইখানা বই বিক্রি হ'য়ে যাবে। তখন গিয়ে তোমার বই একেবারে বেচে ফেল্‌বার প্রস্তাব কর্‌ব। যে বই এমনভাবে বিক্রি হচ্চে, ব্যবসাদার লোক সে বই কিছু সুবিধা দর পেলে নিশ্চয়ই কিনে নেবে। আমরা নগদ টাকা নিয়ে ত সরে পড়্‌ব। তার পর তিনি বই নিয়ে ধুয়েই খান আর যাই করুন। বাঙ্গালা দেশের পাঠকদের চেনা গেছে, তারা বই কিন্‌বে না। কি বল, মন্দ পরামর্শ কি?"

মন্দ নয়! কথাটা আমার ভালই লাগিল। কৌশলের সহিত যদি করা যায়, তাহা হইলে এ ফাঁদে পড়া অসম্ভব নয়।

বীরেশ্বর কহিল, "তা হ'লে আমাদের উপস্থিত দেনা শোধ ক'রে 'কলি ও কুসুমের' দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাবার পর্য্যন্ত টাকা হাতে থাকে।"

আমি কহিলাম, "কোনপ্রকারে এ বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে পার্‌লে তুমি মনে করেছ, এ জীবনে আর আমি কবিতার বই ছাপাব! এই প্রথম এবং এই শেষ! পাপ করেছিলাম বটে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তও অর হচ্চে না!"

৬

পরদিন হইতেই বীরেশ্বর বন্ধুদের দ্বারা 'কলি ও কুসুম' ক্রয় করাই
আরম্ভ করিল। মফস্বলের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট টাকা পাঠা
হইল। নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করিলে যদি কোন প্রকা
সন্দেহ হয়, সেজন্য দিন পনের ধরিয়া এই ব্যাপার চলিল। ইত্যবস
পাওনাদারের উৎপীড়নে আমরা উভয়ে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলাম
মেসের বন্ধুরা তাহাদের টাকার জন্য দিবারাত্র তাগাদা আরম্ভ করিয়া

এমন কি মেসের ম্যানেজার তাহাদের উকিল হইয়া আসিয়া টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করে। ভজহরিবাবু প্রত্যহ সন্ধ্যা ও সকালে মেসে শুভাগমন করিতেছেন; তাঁহার জন্যই আমি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, এমন একটি ভদ্র ব্যক্তিকে এত ক্ষিপ্রবেগে অভদ্র হইয়া উঠিতে দেখিলে কে না মর্ম্মাহত হয়! গ্রামের লোকটি দুই দিন হইল আসিয়া আমার মেসেই আমার খরচে বসবাস করিতেছেন। তাঁহাকে বলিয়াছি, দিন তিন চা'র পরে আমার অবসর হইলে তাঁহার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া দিব। আমার বিশ্বাস, তাঁহার মনে একটা গুরুতর সন্দেহের উদয় হইয়াছে। বীরেশ্বরের দাদা লিখিয়াছেন, তিনি তিন চা'র দিনের মধ্যে কলিকাতায় আসিতেছেন, তিনি আসিয়া চুড়ীর গড়ন স্যাক্‌রাকে বুঝাইয়া দিয়া যাইবেন; এবং যাহার কাছে শাল রাখা হইয়াছিল, সে বলিয়া গিয়াছে, পাঁচ দিনের মধ্যে টাকা না দিলে সে শাল বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। সকলকেই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে টাকা দেওয়া হইবে।

বীরেশ্বর প্রচণ্ড পরিশ্রমের সহিত বহি বিক্রয় করাইতে ব্যস্ত ছিল। এই তাহার শেষ চেষ্টা, ইহাতে নিষ্ফল হইলে একেবারে নিরুপায়!

তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, এমন সময় কলেজ হইতে বীরেশ্বর আসিয়া কহিল, "ললিত দা', আশী খানার বেশী বই বিক্রি হ'য়ে গেছে; আজ সুধাকর সরকারের দোকানে যাব, আর দেরী করা উচিত নয়।"

আমি কহিলাম, "আজ আমিও যাব।"

বীরেশ্বর কহিল, "আজ ত আর বল্‌তে পার্‌বে না বই বিক্রি হয় নি? আজ আমাদেরই জয়! আজ তুমি অনায়াসে যেতে পার।"

পথে যাইতে যাইতে আমি বীরেশ্বরকে বলিলাম, "আজ অন্ততঃ

খরচার দামে বই বিক্রি করা চাই, দেনা শোধ ক'রে যদি এক পয়সাও লাভ না থাকে তাতেও আমার দুঃখ নেই।"

বীরেশ্বর কহিল, "খরচ খরচা বাদে অন্ততঃ দু'শ' টাকা লাভ থাকবে দেখো।"

সুধাকরবাবুর দোকানে উপস্থিত হইলাম। সুধাকরবাবু দুইখানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া সাদরে আমাদের বলিলেন, "বসুন বসুন!"

আমরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলাম। ব্যবসাদার লোক বই বিক্রয় হইয়াছে দেখিয়া একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। আর সে মুরুব্বিয়ানা নাই, সে সদুপদেশের বর্ষণও নাই!

বীরেশ্বর কহিল, "সুধাকরবাবু, আমাদের বই কিছু বিক্রি হ'ল কি?"

সুধাকরবাবু সাগ্রহে কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ বিক্রি হয়েছে;" বলিয়া একজন কর্ম্মচারীকে কহিলেন, "'কলি ও কুসুমের' হিসাবটা তৈয়ার কর শীঘ্র।"

ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে মনে অত্যন্ত হাসি পাইতেছিল! বীরেশ্বরটাকে যা মনে করিয়াছিলাম বাস্তবিক তা নয়, খুব ফন্দীবাজ বটে!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হিসাব করিয়া কর্ম্মচারী একখণ্ড কাগজ সুধাকরবাবুর হস্তে প্রদান করিল। সুধাকরবাবু কাগজখানির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চুরাশীখানি বই বিক্রি হয়েছে, কমিশন বাদে আপনাদের প্রাপ্য হয়েছে ৬৩৲ টাকা। এই নিন ছ'খানা নোট আর তিনটে টাকা;" বলিয়া আমাদের সম্মুখে টাকা ও হিসাবের ফর্দ্দ দাখিল করিলেন।

বীরেশ্বর কহিল, "বিক্রি কেমন হচ্ছে ব'লে আপনার মনে হয়?"

সুধাকরবাবু কহিলেন, "খুব বিক্রি হচ্ছে! প্রধান কবিদের

কবিতার বইয়ের কথা ছেড়েই দিন, নিকৃষ্ট উপন্যাসও এত বিক্রি হয় না!"

রুদ্ধহাস্যে আমার বক্ষপঞ্জর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল। বীরেশ্বরটা ওস্তাদ লোক বটে!

বীরেশ্বর গম্ভীরভাবে কহিল, "দেখুন, আমাদের পক্ষে এ রকম দোকানে দোকানে খুচরা বিক্রি, লাভের হ'লেও অসুবিধের। আপনারা এখন যদি সমস্ত বই কিনে নেন, আমরা সুবিধা দরে ছেড়ে দিতে পারি; ধরুন বাকি আট শ' বই আমরা চা'র শ' টাকায় ছেড়ে দিতে পারি। এতে টাকায় আমাদের কিছু ক্ষতিস্বীকার করতে হয় বটে, কিন্তু হাঙ্গামা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।"

সুধাকরবাবু অল্প হাসিয়া কহিলেন, "মাফ্ কর্‌বেন, সেটা পার্‌ব না; চা'র শ' ত দূরের কথা, চল্লিশ টাকা দিয়েও নয়। এই ত দশ পনের দিনের মধ্যে চুরাশীখানা বই বিক্রি হ'য়ে গেল, আপনারা দশ মিনিট এসেছেন এরি মধ্যেও একখানা বিক্রি হ'ল, কিন্তু আমি যে মুহূর্ত্ত থেকে বই কিন্‌ব সেই মুহূর্ত্ত থেকে বই বিক্রি একেবারে বন্ধ হ'য়ে যাবে।"

দেখিলাম, বীরেশ্বরের মুখ শুকাইয়া সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষীণস্বরে সে কহিল, "কেন?"

সুধাকরবাবু কহিলেন, "সেটা অবশ্য আপনারা আমার চেয়ে ভালই জানেন!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

আমরা দু'জনে স্তম্ভিত নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। সুধাকরবাবু বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, এ ব্যবসায়ে যখন ঢুকি তখন আপনাদের চেয়েও আমার বয়স অল্প ছিল, তার পর এখন ত মাথার সব চুল পেকে এল। এতে তেমন বুদ্ধিমান্ না হ'লেও মানুষের কতকটা জ্ঞান জন্মায়ই। বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ কবিরই বই বিক্রি হয় না, কিন্তু অজ্ঞাতনামা

একজন নূতন কবির বই হুড় হুড় ক'রে বিক্রি হ'তে লাগ্‌লো, আরব্য উপন্যাসের ঘটনার চেয়েও এ যে বিস্ময়জনক! এতে নির্ব্বোধ লোকের মনেও একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। আরও ত পাঁচটা দোকানে বই দিয়েছেন, যদি সন্ধান নিয়ে থাকেন ত জানেন, আর যদি সন্ধান নেন ত জান্‌বেন যে একখানিও বই বিক্রি হয় নি, একখানিও না! এরূপ স্থলে আপনারা হ'লে কি সমস্ত ব্যাপারটা একটা গভীর সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌তেন না?" বলিয়া সুধাকরবাবু পুনরায় মুরুব্বিয়ানা চালে হাসিতে লাগিলেন।

তাহার পর যে সকল নিদারুণ কথাবার্ত্তা হইল, সে সকল কথা লিখিয়া সহৃদয় পাঠকের মনে ব্যথা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এক শত টাকাতেও আট শত পুস্তক খরিদ করিতে সুধাকরবাবু সম্মত হইলেন না। হিসাব ও তেষট্টি টাকা লইয়া যখন ফুট-পাথে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন মনে হইতেছিল কলেজষ্ট্রীটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সরিষার ক্ষেতে ভরিয়া গিয়াছে।

পথে আসিতে আসিতে বীরেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে আড়ালে ডেকে হেমেন্দ্র কি কথা বল্‌ছিল?"

বীরেশ্বর সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "কিছু নয়।"

আমি ধম্‌কাইয়া উঠিলাম, "কিছু নয়? পাঁচ মিনিট ধ'রে দু'জনে মুখোমুখী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলে?"

বীরেশ্বর সভয়ে কহিল, "সুধাকরবাবুর মেয়েকে যদি বিয়ে কর, তা হ'লে বল্‌ছিল আট শ' টাকায় সব বই কিনে নেবে। এখন চার শ' দেবে, বিয়ের পর চার শ' দেবে। তা ছাড়া বিয়েতে ত যা দেবার দেবেই।"

আমি সক্রোধে কহিলাম, "মরে গেলেও না, জেলে গেলেও না।"

মেসে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম, বলিয়া দিলাম, শরীর অসুস্থ, রাত্রে কিছু খাইব না।

৭

পরদিন হইতে নির্য্যাতন আরম্ভ হইল—অসহ্য নির্য্যাতন। মেসের বন্ধুরা, যাহাদের নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলাম, ক্রমশঃ শত্রু হইয়া উঠিল। ভজহরিবাবুর ভদ্রতা কর্পূরের ন্যায় কখন উবিয়া গিয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ক্রোধাগ্নি হইতে সঘন ধূম্র উঠিয়া অভদ্রতার ভূসী স্তরে স্তরে বাড়িয়া উঠিতেছিল। গ্রামবাসী ভদ্রলোকটি প্রকৃত ব্যাপার স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া বীরেশ্বরের দাদার আগমন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার উপর সুধাকরবাবুর কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ ক্রমশঃ উৎপীড়নে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিপদ দেখিয়া বীরেশ্বর সকলকে বিবাহের প্রস্তাবের কথা বলিয়া দিয়াছিল এবং ভজহরিবাবু হইতে গ্রামবাসী লোকটি পর্য্যন্ত বুঝিয়াছিলেন যে, সুধাকরবাবুর কন্যার সহিত আমার বিবাহ হওয়াই তাঁহাদের টাকা আদায়ের একমাত্র উপায়।

সন্ধ্যার সময় আমার ঘরে ভজহরিবাবু, গ্রামবাসী ভদ্রলোক (তাঁহার নাম বিপিনবাবু), মেসের ম্যানেজার প্রভৃতি বসিয়া আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন।

ভজহরিবাবু বলিলেন, "আমাদের টাকা চুকিয়ে দিন না, তার পর আপনি সুন্দরী কন্যার জন্যে দশ বছর অপেক্ষা করুন! প্রাণে যার এত সখ, ঘরে তার পয়সা থাকা দরকার।"

ম্যানেজার বলিলেন, "আর একটা কথা, উপার্জ্জনক্ষম না হ'য়ে বিয়ে করব না, খুব ভাল principle, কিন্তু তার সঙ্গে আর একটা

principle থাকা আবশ্যক, উপার্জ্জনক্ষম না হ'য়ে ধার ক'রে বই ছাপাবে না।"

বিপিনবাবু কহিলেন, "বাপু, আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েই ত কাল। কাল মেয়েদের যদি বিয়ে না হবে, তা হ'লে তারা যায় কোথায় বল? শিক্ষিত হ'য়েও তোমরা এই কথা বল্‌বে? তুমি সঙ্গতিপন্ন নও ব'লে, বিয়ে কর্‌বে না বল্‌ছ? কিন্তু এখানে বিয়ে করলেই যে তুমি সঙ্গতিপন্ন হ'য়ে উঠ্‌বে! ছেলেমানুষী করো না, স্বীকার হও। আজ স্বীকার হ'লে কাল তুমি চার শ' টাকা পাবে। এঁরা আর কতদিন অপেক্ষা কর্‌বেন, আর আমিই বা আর কতদিন বসে থাক্‌ব বল?"

principleএর কথা কিছু নয়। প্রকৃত কথা, কাল মেয়ে বিবাহ করিতে আমার কিছুতেই মন সরিতেছিল না। এত নির্য্যাতনেও নয়! এতদিন ধরিয়া কবিতা লিখিয়া কল্পনার কুঞ্জবনে বাস করিয়া অবশেষে কি না কাল মেয়ের সহিত বিবাহ! পূর্ণিমার সাধনা করিয়া অমাবস্যাকে বরণ!

আমি কহিলাম, "আমাকে ভাব্‌বার একটু সময় দিন, কাল আমি আপনাদের এ বিষয় জানাব।"

ভজহরিবাবু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, কাল যদি আমি তাঁহার টাকার ব্যবস্থা না করি, তাহা হইলে পরদিন তিনি নালিশ করিবেন। ম্যানেজারও বলিলেন, আমাকে নোটিশ্‌ দিবেন। বিপিনবাবু সেরূপ কিছু বলিলেন না, শুধু করুণভাবে চাহিয়া রহিলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে আমি ভাবিতে লাগিলাম, কি করা যায়! শেষটা বিবাহই করিতে হয় দেখিতেছি। কাল মেয়ে? কিন্তু কি করা যাইবে? অনেকেরই ত স্ত্রী কাল—অথচ তাহারাও ত বেশ

হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। আমিই বা এমন কি ধনুর্দ্ধর যে সুন্দরী স্ত্রী না হইলে আমার কোনমতেই চলিবে না? বিবাহ যদি না করি তাহা হইলে ত আর এক দিনও মেসে টেকা যাইবে না। তাহার পর, বেচারী বীরেশ্বর, সেও আমার জন্য অতিশয় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সে ত আমারই উপকারের জন্য এই বিবাদের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার পব, বিবাহ করিলে এই নিদারুণ তাগাদা হইতে একেবারে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ভজহরিবাবু আবার ভদ্র হইবেন, ম্যানেজার নোটিশ্ দিবে না এবং বিপিনবাবুও দ্রব্যাদি কিনিয়া স্কন্ধ হইতে নামিয়া যাইবেন। স্থির করিলাম বিবাহ করাই ভাল। নিজেব অদৃষ্ট হইতে নিজকে জোর করিয়া দুরে রাখিবার চেষ্টা করিলে কষ্টই শুধু বাড়িবে।

বীরেশ্বর বাহির হইতে আসিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "দেনা শোধ কর্বার একটা উপায় কর্তেই হবে, নইলে আর একদিনও চলে না। সুধাকরবাবুর মেয়েকে তুমি কি বিয়ে কর্তে রাজি আছ ললিত দা'?"

আমি কহিলাম, "তোমাদের চক্রান্তে যখন পড়েছি, তখন বিয়ে না ক'রে আর উপায় কি বল? যা বল্বে তাই কর্তে হবে!"

বীরেশ্বর কহিল, "আমি তোমাকে অনিচ্ছায় বিয়ে কর্তে বল্‌চিনে। তুমি যদি স্বেচ্ছায় বিয়ে কর ত কর, নইলে আমিই সে মেয়েকে বিয়ে কর্ব। আমি আজ নির্লজ্জ হ'য়ে এ প্রস্তাব আপনি তাঁদের কাছে করেছি, তাঁরাও রাজি আছেন। আমি যদি আজ তাঁদের শেষ কথা দিই, তা হ'লে কাল তাঁরা আমাদের বইয়ের জন্তে চ'ার শ' টাকা [illegible] বাকি চা'র শ' দেবেন বিয়ের পরে। দেনা শোধ না কর্লে [illegible] নেই, কাবুলীওয়ালার দাদা আস্ছেন, চিঠি পেয়েছি। এখন [illegible] [illegible] হবে।"

আমি আর কি বলিব! কৃতজ্ঞতায় আমার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বহু পুণ্যফলে বীরেশ্বরের মত বন্ধুলাভ ঘটে। আমার সুবিধার জন্য একটা কাল মেয়ে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া সে নিজের সমস্ত জীবন অন্ধকার করিয়া ফেলিতেছে!

আমি বীরেশ্বরের হাত ধরিয়া কহিলাম, "কি আর বল্‌ব বীরু, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন! কিন্তু আমার জন্যে তোমাকে এতটা স্বার্থত্যাগ কর্‌তে কি ক'রে বলি ভাই?"

বীরেশ্বরের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; কহিল, "কিছু বল্‌তে হবে না ললিত দা', কিছু বল্‌তে হবে না। তোমার ভাল হ'লেই বীরেশ্বরের ভাল। এর মধ্যে স্বার্থত্যাগের কোন কথা নেই।"

সেই রাত্রেই বীরেশ্বর ও আমি সুধাকরবাবুর বাটী যাইয়া কথা শেষ করিয়া আসিলাম এবং পরদিন মুটের মাথায় করিয়া সমস্ত বহি সুধাকরবাবুর দোকানে পৌঁছাইয়া দিয়া চারি শত টাকা লইয়া ফিরিলাম।

সকলেরই দেনা পরিশোধ হইয়া গেল। যাতুকরের শূন্যপাত্র হইতে অজস্র পুষ্প বাহির হইতে দেখিয়া তাহার অর্দ্ধেকও বিস্মিত হই না, যত বিস্মিত হইয়াছিলাম ভজহরিবাবুর মুখ হইতে ভদ্রতার বাক্য বাহির হইতে দেখিয়া!

বীরেশ্বরের বিবাহের দিন আমি উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। পাকস্পর্শের নিমন্ত্রণে বীরেশ্বরের গ্রামে উপস্থিত হইলাম। স্থির করিয়াছিলাম, যতই দেখিতে মন্দ হউক না কেন, দেখিয়া মিথ্যা সুখ্যাতি করিয়াও বীরেশ্বরকে একটু উৎসাহিত করিয়া আসিব।

বধূদর্শনকালে কিন্তু বধূ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম! এই সুধাকরবাবুর কাল মেয়ে! এ যে আমার কোনও কবিতার নায়িকা অপেক্ষাও সুন্দরী! অপূর্ব্ব শ্রী এবং লাবণ্যে [illegible] একটি সুন্দরী বালিকামূর্ত্তি।

বীরেশ্বর ওস্তাদ বটে! সে কিন্তু পরে আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিল, বিবাহের পূর্ব্বে সে একবারও সুধাকরবাবুর কন্যাকে দেখে নাই এবং তাহাকে কুৎসিত বলিয়াই তাহার বরাবর একটা ধারণা ছিল। আমার কিন্তু মনে মনে সন্দেহ হয়—

যাক্, এখন কিন্তু আর মনের কথা মনে চাপিয়া রাখাই ভাল।

কিস্তিমাত্

১

শ্রাবণ মাস। সমস্ত দিন অবিশ্রাম বর্ষণের পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশ একেবারে মেঘহীন হইয়া গিয়াছে। বর্ষা-মলিন, সিক্ত ধরণী অব্যাহত সূর্য্যকিরণের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া এক বিচিত্র সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে।

সতীশচন্দ্র তাহার ঘরে একাকী বসিয়া পুলকিতচিত্তে সন্নিকট ভবিষ্যতের বিষয়ে নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছিল। আজ রাত্রে তাহার বিবাহ। আজীবন ধরিয়া প্রেম ও পত্নীর সম্বন্ধে যে সকল মধুর এবং অস্পষ্ট ধারণা নানাদিক হইতে হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছে, আজ তাহাদের সহিত সম্মুখ পরিচয় হইবে! কল্পনার সহিত বাস্তবের আজ মিলন ঘটিবে। একখানি ঢল্‌ঢলে নোলকপরা লজ্জারক্তিম মুখ, একখানি সঞ্চারিণী পল্লবিনী দেহলতা, আর একটি নির্ম্মল বিকচোন্মুখ প্রেমকম্পিত হৃদয়! আজ হইতে এই অমূল্য সম্পত্তির সে একমাত্র অধিকারী হইবে। লাভের কেহ অংশীদার নাই, লোকসানেরও কোন আশঙ্কা নাই।

তাহার পর 'বাসর'!—সেই চির-আকাঙ্খিত, চির-অপেক্ষিত, চির-রহস্যময় বাসর! তন্দ্রালস-নয়নে শ্যালিশ্যালাজগণের সহজ সপ্রতিভ শ্রী এবং নিদ্রাহত শ্রবণে তাঁহাদের সুমিষ্ট পরিহাসবাণী স্বপ্নের ন্যায় অস্পষ্ট অথচ মধুর হইয়া উঠিবে! পার্শ্বে লাজ-সঙ্কুচিতা বধূ, সম্মুখে রহস্যরসিকা শ্যালিশ্যালাজগণ, কণ্ঠে সুগন্ধ মাল্য এবং অদূরে সুমিষ্ট বংশীধ্বনি——

সহসা সতীশ চমকিত হইয়া উঠিল। দুই দিন হইল তাহার বাল্যবন্ধু নৃপেন্দ্রনাথ প্রবাস হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, তাহাকে ত নিমন্ত্রণ করিতে একেবারে ভুল হইয়া গিয়াছে! কিছুতেই তাহা হইতে পারে না—তাহা হইলে সে অত্যন্ত দুঃখিত হইবে।

সতীশ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল—৬॥০টা। নয়টার সময় লগ্ন, গৃহ হইতে আটটার সময় যাত্রা করিবার কথা। যথেষ্ট সময় আছে। কাঁধে একটা চাদর ফেলিয়া সতীশ বহির্গত হইল।

২

নৃপেন্দ্রর গৃহে নৃপেন্দ্র তখন দাবা খেলিতেছিল। বাজি তখন অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। নৃপেন্দ্র বলিতেছে, ঘোড়া উঠিয়া কিস্তি দিলে তিন চালে মাত্‌ অবশ্যম্ভাবী। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্‌ রক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন।

সতীশ কক্ষে প্রবেশ করিল।

সতীশকে দেখিয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "এস সতীশ, খবর সব ভাল ত?" পরক্ষণেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলিল, "ফিরে বসুন মশায়, মাত্‌ আর বাঁচে না।"

সতীশ ধীরে ধীরে আসিয়া বিপন্ন ভদ্রলোকটির পার্শ্বে উপবেশন করিল। দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া সতীশ যে পরিমাণ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল—উৎকৃষ্ট দাবা খেলওয়ার বলিয়া তাহা অপেক্ষা তাহার অল্প প্রসিদ্ধি ছিল না। মায়াবাদের মহিমাবলে হয় ত সে সংসারের সকল দ্রব্য হইতে আত্মসম্বরণ করিতে পারিত, শুধু দাবা খেলার মোহের নিকট সে পরাস্ত। দাবা খেলা পাইলে সংসারের [illegible] ভুলিয়া যাইতে তাহার অধিক বিলম্ব হইত না। বিশেষতঃ

বিপন্নের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাকে রক্ষা করা সতীশের মতে, শুধু রণক্ষেত্রে নহে, দাবা খেলাতেও বীরোচিত কর্ত্তব্য।

সতীশ ভাবিল কথাটা এখন বলিয়া যুদ্ধের এমন গুরুতর অবস্থায় বীরগণকে বাধা দেওয়া নিতান্ত অশিষ্টাচার হইবে। খেলা শেষ হইলে বলিলেই চলিবে, ততক্ষণ খেলাটা একটু দেখা যাক্।

পাঁচ মিনিট গভীরভাবে চিন্তা করিয়া সতীশ বলিল, "মাত্ হয় না। গজের মুখে দাবা ফেলে দিন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"দাবা গেলে আর কতক্ষণ রাখ্‌তে পার্‌ব, মশায়?"

সতীশ বলিল, "দাবা রাখ্‌তে গেলে যে আর তিন চালও রাখ্‌তে পার্‌বেন না। দাবা দিন না—দাবা ভিন্ন কি আর মাত্ করা যায় না?"

দাবা-উৎসর্গের পুণ্যে খেলাটা বাস্তবিকই একটু উন্নতিলাভ করিল। আসন্ন মাতের আশঙ্কা আর রহিল না। খেলা চলিতে লাগিল।

সতীশ প্রথমে মুখে 'চাল' বলিয়া দিতেছিল তাহার পর স্বহস্তে দু'একটা 'চাল' দিতে আরম্ভ করিল, অবশেষে অজ্ঞাতসারে ভদ্রলোকটিকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। পনের মিনিটের মধ্যে দেখা গেল, ভদ্রলোকটি নির্ব্বিরোধী দর্শক হইয়া সতীশের পার্শ্বে বসিয়া খেলা দেখিতেছেন এবং সতীশ নৃপেন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া বসিয়া গভীরভাবে খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

তাহার পর খেলা চলিতে লাগিল—সে কি সুন্দর এবং সুকঠিন্ খেলা! সতীশ বোধ হয় জীবনে কখন সে প্রকার বাজি খেলে নাই। নৃপেন্দ্র দাবা লইয়া বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে—এখন মাত্ না হইলে [illegible]

[illegible] বলিল, "বড়ই কম সতীশ [illegible]

সতীশ উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "আলবৎ হবে।"

অবশেষে হইলও তাই, বিজয়-দৃপ্ত রবে সতীশ বলিল, "কিস্তিমাত্!"

ভদ্রলোকটি পূর্ব্বে কখন্ চলিয়া গিয়াছেন। সতীশ মহা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ক'টা বেজেছে শীঘ্র একবার দেখ ত ভাই।" বিবাহের কথা সে এতক্ষণ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল—এখন চৈতন্য হইল।

পার্শ্বের ঘর হইতে ঘড়ি দেখিয়া আসিয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "ন'টা বেজে পঁচিশ মিনিট।"

"অ্যাঁ! ক'টা বেজেছে?" সতীশের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া বহির্গত হইয়া আসিবার উপক্রম করিল।

নৃপেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "ন'টা বেজে পঁচিশ মিনিট—কেন, তোমার এমন কি ট্রেন ধর্‌তে হবে যে, এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে?"

সতীশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "তোমার ঘড়ি নিশ্চয়ই ভুল আছে!"

নৃপেন্দ্র বলিল, "এক মিনিটও নয়—আজ একটার তোপের সঙ্গে ঠিক ছিল।"

সতীশ বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে! উঃ কি কর্‌লাম—হায়, হায়!" —অধীরভাবে সতীশ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল; পর মুহূর্ত্তেই ঘরে প্রবেশ করিয়া অস্থিরভাবে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নৃপেন্দ্র সতীশকে ধরিয়া ফেলিল, কহিল, "হঠাৎ তুমি এ রকম বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌লে কেন,—সব খুলে বল দেখি?"

সতীশ বলিল, "ভাই, আমি সর্ব্বনাশ করেছি—আজ রাত্রে ৯টার সময় আমার বিয়ে, তোমাকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে এসেছিলাম—দাবা খেলায় মত্ত হ'য়ে কি ঘোর বিপদেই পড়্‌লাম!

বিস্মিত নৃপেন্দ্রনাথ বলিল, "সত্যি নাকি হে?"

"এই দেখ" মণিবন্ধে বদ্ধ পীতবর্ণের সূতা দেখাইয়া অশ্রু-সজল নেত্রে সতীশ চাহিয়া রহিল।

কষ্টে হাস্য দমন করিয়া নৃপেন্দ্র কহিল, "ছি ছি, এত ছেলেমানুষিও করে! এখন উপায়?"

সতীশ বলিল, "উপায় আর ছাই আছে! এত রাত্রে আমি বাড়ী ফির্‌লে আমার অবস্থা কি হবে, বুঝ্‌তেই পারছ। লগ্ন অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। হায়, হায়—কি সর্ব্বনাশ কর্‌লাম?"

নৃপেন্দ্র বলিল, "আর বিলম্ব না ক'রে, এখনই যা হয়, একটা ব্যবস্থা করা উচিত।"

সতীশ বলিল, "আমি ত বাড়ী যেতে পার্‌ব না। এখন বাড়ী গেলে বাবা আমাকে আর আস্ত রাখ্‌বেন না।"

নৃপেন্দ্র কহিল, "কোথায় তোমার বিবাহ হচ্ছে, বল দেখি?"

"১৫ নং বিহারী দত্তের ষ্ট্রীট্ প্রমথ মুখুজ্জ্যের বাড়ী।"

"ওঃ, প্রমথবাবুর বাড়ী? নির্ম্মল তোমার কে হবে?"

"শালা।"

নৃপেন্দ্র কহিল, "নির্ম্মলের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ আছে। দেখি, কোন উপায় হ'তে পারে কি না। তুমি এখানেই অপেক্ষা কর—আমি বিশ মিনিটের মধ্যে তোমাদের বাড়ী আর তোমার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থাটা দেখে আসি। তার পর যা হয় পরামর্শ করা যাবে।"

মোটরে করিয়া নৃপেন্দ্র বহির্গত হইয়া গেল।

সতীশ অধীর হৃদয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত নৃপেন্দ্রনাথের ড্রয়িংরুমে পায়চারি করিতে লাগিল।

কোথায় সে এমন সময় বধূর সহিত বাসরঘরে প্রবেশ করিবে,

তাহা না হইয়া ভাগ্যচক্রে বন্ধুর গৃহে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মত নিরুদ্ধ হইয়া সে ছটফট্ করিতেছে! এত বড় শোচনীয় ব্যাপার আর কি ঘটিতে পারে!

তাহার অদর্শনে বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের লোকেরা যখন ব্যগ্র হইতে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল এবং লগ্ন যখন ব্যর্থ হইয়া ক্ষণে ক্ষণে লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল—তখন সে মূঢ়ের মত সমস্ত বিস্মৃত হইয়া নিশ্চিন্ত-মনে তুচ্ছ দাবা খেলায় মগ্ন ছিল! শঙ্কিতা বধূর সূক্ষ্ম নৈরাশ্য এবং রুষ্ট পিতার তপ্ত ক্রোধ যখন অধীরভাবে তাহার পথ চাহিয়াছিল, তখন তাহাকে অবলীলাক্রমে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, কয়েকটা চক্ষুহীন রাজা এবং মস্তকহীন মন্ত্রী—শুণ্ডহীন গজ এবং পুচ্ছবিহীন অশ্ব!

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দাবার বলগুলা দেখিয়া সতীশের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল সেই কাষ্ঠখণ্ডগুলাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম দেহে লেপন করিয়া সংসার ত্যাগ করিতে পারিলে তাহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়!

৩

সতীশদের গৃহের সম্মুখে আসিয়া নৃপেন্দ্র দেখিল, ভয়ানক অবস্থা! পথে এত লোক জমিয়া গিয়াছে যে, অতি সন্তর্পণেও মোটর লইয়া যাওয়া কঠিন। ব্যাণ্ডওয়ালারা দলে দলে বাদ্যযন্ত্র পার্শ্বে রাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। অ্যাসেটিলিন্ আলোগুলি জ্বলিতেছে—সেগুলাকে পূর্ব্ব হইতেই জল দিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল—দুর্গন্ধের আশঙ্কায় নিভাইয়া দেওয়া হয় নাই। অভুক্ত বরযাত্রিগণ অপেক্ষা করিবে, কি গৃহে ফিরিবে, স্থির করিতে না পারিয়া দলবদ্ধ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সতীশের পিতা উদ্বিগ্নভাবে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান এবং

এক ব্যক্তি—কন্যাপক্ষীয় নিশ্চয়ই—উচ্চস্বরে বলিতেছেন—"আমাদের জাত গেল, ইজ্জৎ গেল! এ কি ভয়ঙ্কর কথা—যে প্রকারেই হউক আপনারা পাত্র সন্ধান ক'রে বা'র করুন!"

সতীশের বাটীর কেহও যাহাতে দেখিতে না পায়, সেইজন্য নৃপেন্দ্র মোটরের হুড্ তুলিয়া দেখিয়াছিল।

সতীশের পিতা বলিলেন, "আমার অপরাধ কি, বলুন? বিপদ আপনাদের অপেক্ষা আমার অল্প নয়। কোথায় ছেলেটা গেল, গাড়ী চাপা পড়্‌ল, না কি হ'ল—কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। থানায় খবর দিয়েছি—চতুর্দ্দিকে লোক পাঠিয়েছি। বিয়ে ত পরের কথা—এখন ছেলে এলে আমি বাঁচি!"

কোনপ্রকারে জনতা হইতে বহির্গত হইয়া নৃপেন্দ্র কন্যার গৃহে উপস্থিত হইল। সেখানেও প্রায় একই প্রকার দৃশ্য। দীপ-শ্রেণী ম্লান, শানাই নীরব—সকলের মুখ বিমর্ষ। কন্যাযাত্রিগণ কন্যার আত্মীয়বর্গকে সম্ভব এবং অসম্ভব নানাপ্রকার পরামর্শ দিতেছে। মোটর হইতে অবতরণ করিয়া নৃপেন্দ্রনাথ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। নির্ম্মল সম্মুখেই বসিয়াছিল—নৃপেন্দ্রকে দেখিয়া বলিল, "আসুন নৃপেনবাবু, আমাদের ত মশায়, আজ ভয়ানক বিপদ!"

নৃপেন্দ্র বলিল, "সব জানি—আপনার পিতা কোথায়?"

নির্ম্মল বলিল, "তিনি বাড়ীর ভিতর শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়েছেন।"

নৃপেন্দ্র নির্ম্মলের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "এই বিষয়েই আপনার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে—একটু নির্জ্জনে চলুন।"

নির্ম্মল তখনই নৃপেন্দ্রকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

আগ্রহসহকারে নির্ম্মল বলিল, "কি বলুন দেখি?"

নৃপেন্দ্র কহিল, "আপনাদের পাত্র সতীশ আমার বিশেষ বন্ধু। সে এখন আমার বাড়ীতে রয়েছে।"

নির্ম্মল বিস্মিতস্বরে কহিল, "কি রকম?"

নৃপেন্দ্র সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিল।

ক্রুদ্ধস্বরে নির্ম্মল কহিল, "দেখুন দেখি—কি অন্যায় কথা!"

নৃপেন্দ্র বলিল, "অন্যায় ত খুবই হ'য়ে গিয়েছে—এখন উপায় কি, বলুন দেখি?"

নির্ম্মল বলিল, "উপায় আর কি—শেষরাত্রে একটা লগ্ন আছে, সেই লগ্নেই বিবাহ হবে।"

নৃপেন্দ্র উৎসুক হইয়া বলিল, "আরও একটা লগ্ন আছে? তবে আর কি! আঃ বাঁচা গেল, ভগবান্‌কে ধন্যবাদ।"

নির্ম্মল বলিল—"লগ্নটা তেমন ভাল নয়—কিন্তু তা ছাড়া এখন ত আর উপায়ও নেই। যা হোক্ নৃপেনবাবু! আপনি যে সংবাদ এনেছেন, তার জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ—"

নৃপেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "ধন্যবাদের পরিবর্ত্তে আমার একটি প্রার্থনা রক্ষা কর্‌বেন, দাবা খেলার কথাটা প্রকাশ কর্‌বেন না—সে বেচারা তা হ'লে অত্যন্ত লজ্জিত হবে।"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "বাহিরের লোকে জান্‌তে পাবে না—কিন্তু তাকে একটু লজ্জা দেওয়াও আবশ্যক। এমন দাবা-পাগ্‌লার কথা আমি ত আর কখন শুনি নি। যে বলেছিল, 'কা'দের সাপ', এ তাকেও হারিয়েছে। যা হোক্ নৃপেনবাবু, আর বিলম্ব নয়—আপনি শীঘ্র বর নিয়ে আসুন। অনেকে অভুক্ত চ'লে যাচ্ছে।"

"আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা পৌঁছাব" বলিয়া নৃপেন্দ্র সত্বর বাহির হইয়া গেল।

৪

নৃপেন্দ্রের মোটরের শব্দ শুনিয়া সতীশ তাড়াতাড়ি ফটকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই কয়েক মিনিট সময় একাকী থাকিয়া সে প্রায় পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে। সতীশকে দেখিয়া নৃপেন বলিল, "শীঘ্র উঠে পড়, আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করা হবে না।"

মোটরে উঠিয়া বসিয়া সতীশ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম অবস্থা দেখ্‌লে ?"

নৃপেন হাসিয়া বলিল, "অবস্থা যতদূর মন্দ হ'তে পারে। কিন্তু ভারি বেঁচে গিয়েছ ম্যান্—আর একটা লগ্ন আছে।"

"কখন্ ?"

"তা বেশ ! প্রায় ভোর বেলা।"

হউক ভোর বেলা, বিবাহ ত হইতে পারিবে ! সতীশের মন কতকটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এতক্ষণ বেচারা ভাল করিয়া দুঃখিত হইতে পারে নাই—এতই তাহার ভয় হইয়াছিল। রোগের সময় রোগী ভাবে, অর্থব্যয় হউক, এখন সারিয়া উঠিলে বাঁচি—কিন্তু যখন বেশ সারিয়া উঠে, তখন ভিজিটের টাকা ও ঔষধের মূল্য পরিশোধ করিবার সময় মনটা হায় হায় করিতে থাকে। সতীশেরও মনে হইল, বিবাহ ত হইবে—কিন্তু বাসরঘরের প্রায় সমস্ত রাত্রির আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার কর্ম্মফলের দণ্ড শোধ করিতে হইল।

নৃপেন্দ্র বলিল—"তোমাদের বাড়ী গিয়ে কি বল্‌বে, বল দেখি ? দাবা খেলার কথা বল্‌লে সকলে তোমাকে প্রহার দেবে।"

সতীশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ ! সে কথা কখনও বলে !"

কিন্তু কি বলিতে হইবে তাহা কোনও মতেই স্থির হইল না। অথচ দেখিতে দেখিতে মোটর সতীশদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া স্থির হইল।

মোটরের মধ্যে সতীশকে দেখিয়া মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। "কি ব্যাপার? কোথায় ছিলে, এতক্ষণ? কোন আক্কেল নাই!" ইত্যাদি ইত্যাদি—।

সতীশের পিতা রোষদীপ্তনয়নে সতীশের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, "আজ বেশ ক'রে আমার মুখোজ্জ্বল করেছ! এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল?"

মোটর হইতে অবতরণ করিয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "আপনারা রাগ কর্‌বেন না—সতীশের কোনও দোষ নেই, সন্ধ্যা সাতটার সময় ও আমাকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে যায়। আমাদের বাড়ী পৌঁছে আমাকে কোনও কথা বল্‌বার পূর্ব্বেই হঠাৎ ওর শরীরটা কেমন অসুস্থ বোধ হওয়ায় ও শুয়ে পড়ে। তার পর একটা ফিটের মত হয়; আমি ওকে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলাম ব'লে, আপনাদের সংবাদ দিতে পারি নি। আধঘণ্টা মাত্র হ'ল, ও সুস্থ হয়েছে। তার পর ওর মুখে বিবাহের কথা শুনে আমি তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে এসেছি।"

সতীশের পিতা চিন্তান্বিত হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে আজ রাত্রে বিবাহ কেমন ক'রে হয়?"

নৃপেন বলিল, "তা অনায়াসে হবে—এখন সতীশের আর কোনও দুর্ব্বলতা নেই।"

সতীশের পিতা কহিলেন, "পার্‌বে?"

"তা পার্‌বে" বলিয়া নৃপেন সতীশের দিকে চাহিয়া সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "পার্‌বে ত হে?"

সতীশ কৃতজ্ঞনেত্রে নৃপেনের দিকে চাহিল। সেই আজ তাহাকে রক্ষা করিয়াছে!

কন্যাপক্ষ হইতে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সতীশের পিতা তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইয়া সংবাদ দিতে বলিলেন—এবং বলিয়া দিলেন যে, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বর এবং বরযাত্রীসহ তিনি কন্যাগৃহে উপস্থিত হইবেন।

কিন্তু ব্যাণ্ড বাজাইয়া এবং আলো জ্বালাইয়া বর যখন কন্যাগৃহে উপনীত হইল, তখন পুনরায় এক নূতন বিভ্রাট উপস্থিত হইল। প্রমথবাবু আসিয়া সতীশের পিতাকে কহিলেন, "পাত্রের এরূপ মূর্চ্ছারোগ আছে, তা আমরা জান্‌তাম না। এ রকম অবস্থায় কোন্ পিতা কন্যার সহিত বিবাহ দিতে সাহস করে বলুন—বিশেষতঃ আজই সন্ধ্যাবেলা যখন মূর্চ্ছা হয়েছে—তখন অন্ততঃ আজ রাত্রে ত বিবাহ হ'তেই পারে না!"

সতীশের পিতা কহিলেন, "আপনাদের পক্ষে উদ্বিগ্ন হবার কথা বটে—কিন্তু আমার পুত্রের মূর্চ্ছারোগ নাই। সমস্ত দিন উপবাস ক'রে হঠাৎ একটা কেমন দুর্ব্বলতা বোধ হওয়ায় ফিটের মত হয়েছিল। ও কিছুই নয়।"

প্রমথবাবু বলিলেন, "তা হ'তে পারে—কিন্তু—"

সতীশের পিতা অধীরভাবে বলিলেন, "এর মধ্যে আর কিন্তু নেই—তা হ'লে বলুন, আমরা ফিরে যাই।"

নৃপেন দেখিল, মহা* বিপদ উপস্থিত! পুনরায় নির্ম্মলের সহায়তাগ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তখন সে নির্ম্মলের উদ্দেশ্যে ছুটিল। কিন্তু নির্ম্মল তখন গৃহে নাই—বরফ আনিতে চিৎপুরে গিয়াছে।

উৎপীড়িত বর এবং ক্ষুৎপীড়িত বরযাত্রী বিরক্ত এবং অপমানিত বোধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম করিতেছে, এমন সময় একখানা থার্ডক্লাস গাড়ীর মাথায় বরফ লইয়া নির্ম্মল উপস্থিত হইল।

নৃপেন তাড়াতাড়ি নির্ম্মলের নিকট গিয়া বলিল, "মশায়, আবার ত নূতন বিপদ উপস্থিত।"

ললাট হইতে ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া উদ্বিগ্নভাবে নির্ম্মল কহিল, "আবার কি হ'ল ?"

"আপনার বাবার ধারণা হয়েছে, সতীশের মূর্চ্ছারোগ আছে, তাই বিবাহ দিতে তিনি অনিচ্ছুক। বর ফিরে যাচ্ছে।"

নির্ম্মল বলিল, "মনে করেছিলাম, দাবা খেলার কথা বাবাকে বল্‌ব না—কিন্তু এখন না বল্‌লে আর চলে না। নৃপেনবাবু, আপনি পাঁচ-মিনিট বর আট্‌কে রাখুন, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি ;" বলিয়া নির্ম্মল ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার পিতার নিকট ছুটিল।

প্রমথবাবুকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া নির্ম্মল সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল।

প্রমথবাবু বিস্মিত হইয়া বলিল, "এত অন্যমনস্ক ! সেও ত একটা মস্ত রোগ ! যা হোক্ একথা আমাকে আগে না ব'লে ভাল কর নি। এখন ভদ্রলোকদের পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে আনা যাক্।"

প্রমথবাবু সতীশের পিতাকে দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আপনার কথাতে আমার মন নিরুদ্বেগ হয়েছে, আর কোন দ্বিধা নেই। আপনি দয়া ক'রে বর ও বরযাত্রী নিয়ে দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ করুন।"

৫

সতীশ বেচারা বাসরঘরে নিতান্ত হতাশ হয় নাই। পার্শ্বে লাজনম্র বধূ বিনোদিনীর যত্নাচ্ছাদিত সৌন্দর্য্যের যতটুকু আভাস পাওয়া যাইতেছিল, তাহাতেই তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল এবং হাস্যময়ী রহস্যরসিকা শ্যালিশ্যালাজগণের সহিত সুমিষ্ট পরিহাস ও আলাপে

সময়টা ফাল্গুনমাসের ফুর্‌ফুরে হাওয়ার মত অবলীলাক্রমে বহিয়া যাইতেছিল। তবে দুঃখের বিষয়, সময় অতি অল্প—হঠাৎ কখন্ পূর্ব্বগগন আরক্তনেত্রে জাগিয়া উঠিয়া সুখের অত্যল্প সময়টুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলে।

বিনোদিনীর বড় ভগিনী মণিমালিনী বলিল, "তুমি যা হোক্, আজ আমাদের খুব ভাবিয়েছিলে! হঠাৎ মূর্চ্ছা কেন হয়েছিল বল দেখি?"

সতীশ মূর্চ্ছার প্রসঙ্গে বিব্রত হইয়া উঠিতেছিল। মিথ্যা কথা না বলিলেও নয়—অথচ বিবাহবাসরে বসিয়া অনবরত মিথ্যা কথা বলিতেও তাহার বিরক্তি বোধ হইতেছিল! সে কহিল, "বোধ হয় বিয়ের আনন্দেই মূর্চ্ছা হয়েছিল!"

সুবাসিনী হাসিয়া বলিল, "তাই হবে! সে জন্য আমাদের ভয় হচ্ছিল! শুভদৃষ্টির সময় বিনুর মুখ দেখে আবার মূর্চ্ছা না যাও!"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "আমারও সেই ভয় হয়েছিল, কিন্তু মুখ দেখে দেখ্‌লাম তত ভয়ঙ্কর নয়।"

উষালতা কহিল, "তা হ'লে পছন্দ হয়েছে দেখ্‌চি!"

সত্যশীলা বলিল, "পছন্দ হয়েছে তা আর বুঝতে পাচ্ছনা? সব কথাতেই দেখ্‌ছ না কত অন্যমনস্ক, অথচ একজনের দিকে খুব মন আছে। সে একটু নড়্‌ছে কি না, তার মাথার চেলিটি একটু সরে যাচ্ছে কি না, তার চুড়ীর কি রকম শব্দ হচ্ছে, সে সব দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য আছে।"

সতীশ হাসিয়া কহিল, "অথচ তিনি আমার প্রতি কিছুমাত্র মনস্ক নন। কি দুরন্ত অকৃতজ্ঞতা! যাই হোক্, আমি যদি আপনাদের প্রতি অন্যমনস্ক হ'য়ে থাকি, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমার গুরুতর অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করবেন।"

রমণীগণের চক্ষে চক্ষে একটা ইঙ্গিত বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। অন্যমনস্কতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহাদের শুধু একটা চক্রান্ত মাত্র।

মণিমালিনী বলিল, "তুমি আর এমন কি অন্যমনস্ক হয়েছ ?" সত্যশীলার দিকে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ নতুন বৌ, সে সাহেবটা কি ভয়ানক অন্যমনস্ক ভাই! চুরুট খেতে খেতে ঘরে ঢুকে, চুরুটটা ফেলে দিতে গিয়ে ভুলে মাথা থেকে টুপিটা খুলে জানালা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে, চুরুটটা টুপীর র‍্যাকে রেখে দিয়েছিল!"

সকলে উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। সতীশও হাসিতে লাগিল।

সত্যশীলা কহিল, "আর সেই লোকটা ? যে ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে ঘরে ঢুকে, অন্যমনস্ক হ'য়ে নিজের বিছানায় ছড়িটাকে শুইয়ে দিয়ে, নিজে ছড়ি হ'য়ে, ঘরের কোণে সমস্ত রাত্রি রক্তবর্ণ চোখ ক'রে, জেগে দাঁড়িয়েছিল!"

রমণীগণ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। সতীশ হাসিতে হাসিতে কহিল, "চমৎকার!"

সুবাসিনী কহিল, "আর সেই লোকটাই বা কি কম অন্যমনস্ক, যে দাবা খেলায় উন্মত্ত হ'য়ে, তার স্ত্রীকে সাপে কামড়েছে শুনে বলেছিল, 'কাদের সাপ' ?"

সকলে হাসিতে লাগিল। কিন্তু এবার সতীশ আর হাসিতে পারিল না; লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল, হাসিতে হাসিতে যাহার মধ্যে সে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা তাহাকে ধরিবার জন্য জাল ভিন্ন কিছুই নহে! এখন তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসাই কঠিন!

কৌতুকপরায়ণা, সুচতুরা এই রমণী কয়েকটি সতীশের দাবা খেলার কথা যে জানিতে পারিয়াছে, এবং সেই জন্যই যে এই সকল গল্পের অবতারণা করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সতীশের কোন সন্দেহ রহিল না।

মণিমালিনী কহিল, "সতীশ, তুমি এমন কোন অন্যমনস্কতার গল্প আমাদের শোনাতে পার, যা আরও অসম্ভব, আরও মজার? যা শুন্‌লে আরও হাসি পায়?"

সতীশ শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। স্পষ্ট করিয়া কোনও কথা হইবার পূর্ব্বে কেমন করিয়া সে তাহার দাবা খেলার বিষয়ে কোনও কৈফিয়ৎ দেয়; আর কৈফিয়ৎ দিবেই বা কি?

গ্রহণকালের রৌদ্রের মত ফিকা হাসি হাসিয়া সতীশ বলিল, "এর চেয়ে কম অসম্ভব গল্পও আমি জানিনে।"

সুরমা এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই, বলিয়া উঠিল, "আমি জানি। একজন তার বিয়ের দিন সন্ধ্যাবেলায়, দাবা খেলায় এমন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল যে, যখন তার খেলা শেষ হ'ল, তখন রাত্রি সাড়ে নয়টা বেজে গিয়েছে। বাজি মাত্ হ'ল বটে, কিন্তু এদিকে ততক্ষণে লগ্নও মাত্! অবশেষে সে বেচারা লজ্জা ঢাক্‌বার জন্যে যে কথা বলেছিল, তাতে সে আরও বিপদে পড়্‌বার যোগাড় করেছিল——"

হাসিয়া সকলের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল। এমন সময়ে তথায় সতীশের শ্বশ্রূঠাকুরাণী উপস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, "তোমরা সতীশকে একটুও ঘুমতে দিলে না দেখ্‌ছি, সন্ধ্যাবেলায় অমন অসুখ করেছিল—একটু ঘুমতে দাও, আর গোল করো না।"

অসুখের কথায় কিন্তু গোল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। রমণীগণ হাসিয়া আরক্ত হইয়া উঠিলেন। সতীশও রক্তবর্ণ হইয়া মনে করিতে লাগিল—কতক্ষণে ভোর হইবে যে, বাহিরে পলাইয়া একটু পরিত্রাণ পায়!

দ্বিতীয় পক্ষ

১

তারাপদর জীবনের অতি শঙ্কটের সময়ে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তাহার স্ত্রী একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া হঠাৎ তারাপদকে ফাঁকি দিয়া পরলোকে প্রস্থান করিল। তারাপদ জানিত সন্তানই মরিবে, কারণ এতাবৎকাল সেইরূপই ঘটিয়া আসিয়াছে, সেই জন্য সে প্রস্তুতই ছিল; কিন্তু অভিজ্ঞতাকে প্রবঞ্চিত করিয়া স্ত্রীও যখন ছাড়িয়া গেল, তখন তারাপদ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। সংসারে একমাত্র স্ত্রী ভিন্ন তাহার অপর কেহই ছিল না এবং এই দুর্ভাগিনী রমণীটি তাহার জীবন দিয়াও কোন প্রকারে তারাপদর বংশবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রতিবারই হয় মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইত, অথবা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশু মারা যাইত। এবার মৃত সন্তানের মুখ একবার মাত্র নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন-হৃদয়া জননীও চক্ষু মুদিত করিল; তারাপদর সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সে চক্ষু আর কিছুতেই উন্মীলিত হইল না।

আত্মীয়-স্বজন ছিল না বলিয়াই হউক বা তারাপদ লোকটি অতিশয় মিশুক বলিয়াই হউক, তাহার একদল বন্ধু আত্মীয়-স্বজনের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। তাহারা অবাধে তারাপদর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত এবং অন্তঃপুরের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী তারাপদর স্ত্রী, মিষ্ট ব্যবহারে, বিশেষতঃ মিষ্টান্নের ব্যবহারে, এই সুবৃহৎ দেবর-সম্প্রদায়কে নিতান্ত অনুগত করিয়া লইয়াছিল। তারাপদ সকৌতুক আনন্দের সহিত এই দেবর-ভাজের ক্রীড়া পর্য্যবেক্ষণ করিত; এবং এই সম্পর্ক

স্থাপনার মূলে তাহার উদার সহানুভূতি বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই উভয়পক্ষ হইতে সেটি এত সুমধুর এবং সঙ্কোচহীন হইয়া উঠিয়াছিল।

স্ত্রীর শোক অবশ্য প্রচণ্ডভাবে তারাপদকে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু এমন একটি লোক ছিল না যে, শোকের সময় সান্ত্বনা দেয়, আহারের সময় অনুরোধ করিয়া আহার করায় এবং ব্যবস্থাহীন গৃহের মধ্যে একটু শ্রী ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। আত্মীয়ের মধ্যে তারাপদর এক নিঃসন্তান মাসী ছিলেন—হুগলীর সন্নিকট এক পল্লীগ্রামে তাঁহার দুই তিন বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, মাসী হরিপ্রিয়া তাঁহার সমস্ত দেহ-মন দিয়া সেই জমিটুকু দখল করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে একটা গভীর আশঙ্কা ছিল যে, বেশী দিন অন্যত্র থাকিলে তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশী পরাণ বাঁড়ুয্যে তাঁহার শ্বশুরকুলের সপ্তপুরুষের সেই অমূল্য জমিটুকু নিজের জমির সহিত ঘেরিয়া লইয়া দখল করিয়া ফেলিবে। তখন তাহার সহিত মামলা মোকদ্দমাই বা কে চালাইবে, আর লাঠালাঠিই বা কে করিবে! তারাপদ হরিপ্রিয়াকে অভিভাবকের মত রাখিবার জন্য অনেকবার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু হরিপ্রিয়া কোনমতে তাহাতে স্বীকৃতা হইতেন না। তিনি শ্রীরামপুরে তারাপদর গৃহে নিশ্চিতমনে বসবাস করিবেন, আর পরাণ বাঁড়ুয্যে তদবসরে তাঁহার গাছের ফল আর পুকুরের মাছ ইচ্ছানুরূপ ভোগ করিবে এ চিন্তা হরিপ্রিয়ার কাছে অসহ্য মনে হইল। সেইজন্য সহজে হরিপ্রিয়া শ্রীরামপুরে আসিতেন না, নিতান্ত যখন কেহ মরিত, অথবা কাহারও বিবাহ হইত, তখন অল্প দিনের জন্য হরিপ্রিয়া শ্রীরামপুরে আসিতেন।

এবার যখন হরিপ্রিয়ার নিকট তারাপদর স্ত্রী-বিয়োগের সংবাদ এবং তদুপলক্ষে শ্রীরামপুরে তাঁহার আমন্ত্রণ উপস্থিত হইল, তাহার

একমাস পূর্ব্বে পরাণ বাঁড়ুয্যে সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, কথা ছিল ছয় মাসের পূর্ব্বে তীর্থ হইতে ফিরিবেন না। কতকটা নিশ্চিন্তমনে ঘর-দুয়ার বন্ধ করিয়া হরিপ্রিয়া শ্রীরামপুর যাত্রা করিলেন।

২

শোকের প্রথম বেগটা কাটিয়া গিয়া তারাপদ যখন আবার অনেকটা সহজভাবে মেলা-মেশা, আফিস যাওয়া, এমন কি তাস খেলা, গান গাওয়া প্রভৃতি করিতে লাগিল তখন হরিপ্রিয়া পুনরায় তারাপদর বিবাহ দিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। পরাণ বাঁড়ুয্যের দীর্ঘ অনুপস্থিতির মধ্যে এই হাঙ্গামাটা সারিয়া যাইতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। নচেৎ আবার কোন্ সময়ে হঠাৎ তাঁহার ডাক পড়িবে, তখন ত সেই ডাইনের হস্তে পুত্র সমর্পণ করিয়া আসিতে হইবে!

বিনয় তারাপদর একজন বন্ধু, তাহার স্ত্রী ললিতা তারাপদর সহিত কথা কহিত এবং গ্রাম সম্পর্কে বিবাহের পূর্ব্ব হইতে তারাপদকে দাদা বলিয়া ডাকিত। একদিন দ্বিপ্রহরে গৃহকর্ম্মান্তে হরিপ্রিয়া একটু বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ললিতা আসিয়া উপস্থিত হইল।

মনে মনে ততটা প্রসন্ন না হইলেও হরিপ্রিয়া কহিলেন, "এস মা এস। ক'দিন দেখি নি কেন?"

সে কথার উত্তর না দিয়া ললিতা কহিল, "মাসীমা, তারাদাদার বিয়ের কি কচ্ছেন? পাত্রী সন্ধান কচ্ছেন কি?"

হরিপ্রিয়া কহিলেন, "বিয়ে দিয়ে যেতে পার্‌লেই ত আমি নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু কে খোঁজ খবর করে বল? তোমরা মা মনোযোগী হ'য়ে একটু খোঁজ তল্লাস কর!"

ললিতা কহিল, "আমি সেই কথাই বল্‌তে এসেছি। কল্‌কাতায় আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা আছেন, তাঁর একটি মেয়ে আছে। কাল সে আমাদের বাড়ী এসেছে, কাল সকালে চ'লে যাবে। মেয়েটি, মাসীমা, নিখুঁৎ সুন্দরী, বয়সও প্রায় পনের হবে। কাকার অবস্থা ভাল নয়, টাকা কড়ি দিতে পার্‌বেন না। কিন্তু তারাদাদার বিয়ে যদি দিতে হয়, তা হ'লে এই রকম মেয়ের সঙ্গেই দেওয়া উচিত। চলুন না মাসীমা, দেখে আস্‌বেন।"

পরাণ বাঁড়ুয্যের প্রত্যাগমনের আর মাত্র দুই মাস বিলম্ব ছিল। বিশ্রামের বাসনা অকাতরে ত্যাগ করিয়া হরিপ্রিয়া কন্যা দেখিতে চলিয়া গেলেন। কন্যা দেখিলে তারাপদ বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইতে পারিবে না, কন্যা দেখিয়াই হরিপ্রিয়া তাহা বুঝিলেন। মেয়েটি একটি সৌন্দর্য্যের নির্ঝর।

সন্ধ্যার পর আফিস হইতে ফিরিয়া হাত মুখ ধুইয়া তারাপদ হরিপ্রিয়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, হরিপ্রিয়া নিশ্চিন্তমনে মালা জপ করিতেছেন।

তারাপদ একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "মাসীমা, এখনও রান্না চড়ে নি ?"

হরিপ্রিয়া প্রসন্ন হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আজ তোমার বিনয়ের বাড়ী নেমন্তন্ন। একটু জল খেয়ে নাও, সেখানে খেতে হয় ত রাত হবে।"

তারাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের নেমন্তন্ন মাসীমা ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরিপ্রিয়া কহিলেন, "ওদের বাড়ীতে কল্‌কাতা থেকে লোকজন এসেছে, তাই খাওয়ান আছে। জল খেয়েই যাও বাবা, দেরী করো না ;" বলিয়া হরিপ্রিয়া একটি কাঁসার রেকাবে দুইটি সন্দেশ ও এক গ্লাস জল তারাপদর সম্মুখে রাখিলেন।

জল খাইতে খাইতে তারাপদ কহিল, "মাসীমা, লক্ষ্মীপুর থেকে আর চিঠি পত্র কিছু পেয়েছ ?"

হরিপ্রিয়া কহিলেন, "না ; সেই শনিবারে পেয়েছিলাম—আর পাই নি।"

তারাপদ কহিল, "মাসীমা, তোমার কাঁঠাল গাছে এবার কাঁঠাল হয়েছে কেমন ?"

হরিপ্রিয়া কহিলেন, "মন্দ হয় নি, আট টাকার ফল বেচে এসেছি।"

পরাণ বাঁড়ুযোর প্রসঙ্গ আজ কোনমতে উঠিল না দেখিয়া তারাপদর মনে গভীর সন্দেহ হইতেছিল, নিশ্চয়ই আজ গুরুতর একটা কিছু ঘটিয়াছে। তাহার উপর হরিপ্রিয়ার সুপ্রকাশ প্রসন্নতা এবং বিনয়ের বাড়ী অকারণ নিমন্ত্রণ, সকল লক্ষণগুলাই বিশেষ একটা অনুমানের অনুকূল বলিয়া তারাপদর মনে হইতেছিল। কিন্তু শুধু অনুমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা আপত্তি করা চলে না—কাজেই তারাপদ নিরুপায় হইয়া বিনয়ের বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

বিনয়ের গৃহ হইতে যখন তারাপদ ফিরিল, রাত্রি তখন প্রায় বারটা।

হরিপ্রিয়া জাগিয়া ছিলেন ; তারাপদকে ডাকিয়া কহিলেন, "পদ, মেয়েটি দেখেছ ?"

তারাপদ ধীরভাবে কহিল, "দেখেছি।"

হরিপ্রিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "এমন সুন্দরী মেয়ে ত এত বয়সে আমি একটিও দেখি নি ! মেয়ে ত নয় যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা —পদ্মের উপর দাঁড়ালেই তাকে মানায় ! তা হ'লে পদ, এ মাসের আটাশে তারিখে বিয়ের ব্যবস্থা করি ?"

তারাপদ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

হরিপ্রিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন ; কহিলেন, "এ মেয়ে হাতছাড়া

কর্লে পরে অনুতাপ কর্তে হবে। বিয়ে তোমার, বাবা, কর্তেই হবে —তখন এমন পে'য়ে ছেড়ে দেওয়া অবুঝের কাজ হবে। বৌমা আমার সতীলক্ষ্মী ছিলেন, বিবাহ না ক'রে তুমি কষ্ট পেলে মনে করো না তিনি পরলোকে সুখ পাবেন। আমি কাল সকালে মেয়েটিকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্বো—আমার কাছে একখানা গিনি আছে—নগদ টাকা কিছু দিও।”

ইহাতেও তারাপদ কোন কথা কহিল না দেখিয়া হরিপ্রিয়া মনে মনে চটিয়া উঠিলেন; কহিলেন, “আমি তোমার মা'র মত। তোমার মা থাক্লে তাঁর কথা কি তুমি ঠেল্তে পার্তে? আমার কথা যখন রাখ্বেই না তখন আমার এ বিষয়ে অনুরোধ করাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু বাবা এর পর যখন বিয়ে কর্বে, তখন যদি আস্তে না পারি, কিছু মনে করো না কিন্তু—ঘর বাড়ী, গাছ পালা সব শত্রুর হাতে রেখে আসা কি যে বিপদ সে আমিই জানি। পরাণ বাঁড়ুয্যেকে তোমরা ত চেন না, কোন্ দিন যে সে কি ক'রে বসে, তা কিছুই বলা যায় না।”

তারাপদ দেখিল, পরাণ বাঁড়ুয্যের প্রসঙ্গ সবেগে আসিয়া পড়িয়াছে —তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সে কহিল, “মাসীমা, রাত অনেক হয়েছে—আজ এ সব কথা থাক্, কাল হবে;” বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

তারাপদর অভ্যন্তরে ভাব-প্রবণতা অপেক্ষা কার্য্য-প্রবণতাই অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। প্রমাণ—বারটার সময় ঘরে প্রবেশ করিয়া রাত জাগিয়া সে গবেষণা করে নাই, এবং পরদিন প্রত্যূষে হরিপ্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইতেই কহিল, “মাসীমা, তুমি বল্ছিলে মা'র কথা আমি অমান্য কর্তে পার্তাম না—তোমার কথা পারি—এ ধারণা তোমার ভুল।

তোমার আদেশ অমান্য কর্‌বার সাধ্য আমার নেই। তবে এইটুকু অনুরোধ, সব দিক ভেবে তার পর আদেশ করো।"

হরিপ্রিয়া আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া কহিলেন, "তা আমি জানি, তুমি আমার কথা নিশ্চয়ই রাখ্‌বে। আমি সব দিক ভেবে দেখেছি, এ মেয়ে আমি ছাড়্‌ব না। গোটা দশেক টাকা দাও, আশীর্ব্বাদ ক'রে আসি।"

একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। তারাপদ লোকটা কতকটা ভাব-প্রবণও বটে। আলমারী হইতে টাকা বাহির করিবার সময় তাহার চক্ষে এক ফোঁটা অশ্রু আসিয়া পড়িয়াছিল।

৩

"দ্বিতীয় পক্ষের নাম কনকলতা। আকৃতির সহিত নামটির দুই প্রকারে সার্থকতা ছিল। বর্ণ—তাহার কনকেরই মত সুন্দর, এবং গঠন—লতার মতই কোমল ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝা গেল, নামটি কনকলতার পরিবর্ত্তে লৌহশৃঙ্খল হইলে অপর একটা দিক হইতে অধিকতর সার্থক হইত—অর্থাৎ অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তারাপদকে যে কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিলেন, সে বন্ধন কনকলতার মত মধুর হইতে পারে, কিন্তু লৌহশৃঙ্খলেরই মত দৃঢ়!—শৃঙ্খলটির প্রসার ছিল তারাপদর আফিস পর্য্যন্ত—কিন্তু ছুটির দিনে এবং রবিবারে তাহা দৃঢ়ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া তারাপদর অন্তঃপুরেই আবদ্ধ থাকিত, বৈঠকখানা পর্য্যন্তও সহজে পৌঁছাইত না। বন্ধুগণ তারাপদর বিবাহের পর পুনরায় পূর্ব্বের মত বৈঠকখানায় আড্ডা জমাইবার চেষ্টায় ছিল—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারা আসিলেই তারাপদর হয় মাথা ধরিত, কিংবা পেট কামড়াইত, কিংবা এমন একটা কিছু হইত যাহাতে তাহাকে অন্দরে

যাইয়া শুইয়া পড়িতে হইত এবং শুশ্রূষার জন্য কনকলতার উপস্থিতি অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত।

বন্ধুরা পূর্ব্বের মত মধ্যে মধ্যে যখন তারাপদর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত, তখন তারাপদ মনে মনে ব্যস্ত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিত। তাহার ব্যগ্র নয়ন সতর্ক প্রহরীর মত চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিত এবং কোন প্রকারে যদি কনকলতার বসনের অঞ্চল কিংবা অঙ্গুলির নখটি দেখা যাইত, কিংবা কাশির আওয়াজ অথবা চুড়ীবালার শব্দ শুনা যাইত, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিত না! দুর্ব্যবহারে পীড়িত হইয়া বন্ধুদের ত ফিরিতে হইতই—কনকলতার প্রতিও সমস্ত দিন ধরিয়া জুলুম চলিত!

বন্ধুগণ অনতিবিলম্বে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল; তাহারা তারাপদর অন্তঃপুরে প্রবেশ করা বন্ধ করিয়া দিল এবং ক্রমশঃ তাহার বহির্বাটীতে আসাও পরিত্যাগ করিল। কিন্তু রোগে যাহাকে ধরিয়াছে, অপরে তাহার কি করিবে? তারাপদর মন আর কিছুতেই পরিষ্কার হয় না। একটা সন্দেহ, একটা অসন্তোষ মনের মধ্যে সর্ব্বদা কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকে। অভিযোগের কোন কারণ নাই—অনুযোগের কোন নিদর্শন নাই—তথাপি একটা গোলযোগ যেন কোথায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়—মনটা কোন রকমেই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে, এই কষ্টকর সন্দেহটা ভালবাসারই সহিত সমভাবে বাড়িয়া উঠিতেছিল এবং বেচারা কনকলতা তাহার স্বামীর ভালবাসার অত্যাচার এবং সন্দিগ্ধতার উৎপীড়নের মধ্যে পড়িয়া উভয়ের নিষ্পেষণে ক্রমশঃ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামীর সহিত কোন সময়ই তাহার সহজ সচ্ছন্দভাবে কাটিত না। হয় আগ্রহ, নয় নিগ্রহ; হয় বিলাপ, নয় আলাপ; একটা না একটা কিছু পিছনে লাগিয়াই থাকিত।

তারাপদর সর্ব্বাপেক্ষা ভয় হইত কনকলতার তরল স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া—এত হাসি, এত রঙ্গ, এত চঞ্চলতা, নয়নের মধ্যে এমন জ্যোতি, বুদ্ধির সহিত এমন প্রখরতা—ইহাকে কি বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়! তাহার পর, সৌন্দর্য্যের এমন একটি দীপ্ত দীপশিখা যেখানে উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে, তাহার আশে পাশে পতঙ্গেরা লুব্ধ হইয়া যে ঘুরিয়া বেড়ায় না তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? তাই সদর দুয়ারে কঠিন স্প্রীং বসাইয়া এবং জানালায় জানালায় ঘন পর্দ্দা মারিয়াও তারাপদর মন নিশ্চিন্ত হইল না। দুয়ারের পার্শ্বে কোথায় একটি ছিদ্র, পর্দ্দার পার্শ্বে কোথায় একটু ফাঁক, কোন্ ছিট্‌কানিটি আল্‌গা হইয়াছে, কোন্ হুড়্‌কাটা বাহির হইতে খুলিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে সেই সকল দেখিয়া দেখিয়া বেচারা পতঙ্গের পথ বন্ধ করিত।

কনকলতা সব দেখিত, সব বুঝিত, মুখে সে কিছু বলিত না, কিন্তু মনের মধ্যে বিরক্তি-মিশ্রিত এমন একটা দুর্জ্জয় অভিমান নিয়ত বাড়িয়া উঠিতেছিল, যাহার অন্তরালে দ্বিতীয় পক্ষের অনুদ্দাম ভালবাসাটুকু প্রায় ঢাকিয়া আসিয়াছিল। এত অবিশ্বাস! এত সন্দেহ! এমন লোকের ত বিবাহ না করাই উচিত ছিল!

বন্ধুদের যাওয়া আসা ত একপ্রকার বন্ধ হইয়াছিল—সে বিষয়ে তারাপদ কতকটা নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু তাহা অপেক্ষা গুরুতর একটা ব্যাপারের কোন উপায়ই সে করিতে পারিতেছিল না। বন্ধুপত্নীগণ এবং প্রতিবেশিনী সঙ্গিণী এবং গৃহিণীগণ সর্ব্বদাই তারাপদর গৃহে বেড়াইতে আসিতেন। ভদ্রতা রক্ষার জন্য কনকলতাকেও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাটী যাইতে হইত। আফিস হইতে আসিয়া তারাপদ যদি শুনিত যে, দ্বিপ্রহরে কনকলতা কোন প্রতিবেশিনীর গৃহে বেড়াইতে গিয়াছিল, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিত না। নানা ছলে তারাপদ স্ত্রীকে জেরা আরম্ভ

করিত। কখন্ গিয়াছিলে, কখন্ আসিলে, তাহাদের বাড়ী কে কে ছিল, পুরুষ কেহ উপস্থিত ছিল কি না—পথে যাইতে আসিতে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে কি না—ইত্যাদি। উত্তর দিতে দিতে কনকলতা বিরক্ত হইয়া উঠিত এবং যদি কোনপ্রকারে প্রকাশ পাইত যে, সে বাটীতে কোন পুরুষ উপস্থিত ছিল, কিংবা পথে কোন পুরুষ লোক সম্মুখে পড়িয়াছিল তাহা হইলে দুই তিন দিন ব্যাপী একটা কলহ-বিপ্লবের অভিনয় চলিতে থাকিত।

ক্রমশঃ এই অবিশ্বাসের পীড়ন কনকলতার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।

৪

শনিবার। তারাপদ সকাল সকাল আফিস হইতে বাটী ফিরিতেছিল। পাড়ার পথে তাহার এক বন্ধু গোপালের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

গোপাল তারাপদকে দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "লোকে বলে, অভাগার ঘোড়া মরে আর ভাগ্যবানের বউ মরে—তা সে কথা ঠিক দেখ্লাম।"

তারাপদ সন্দিগ্ধভাবে কহিল, "কেন ?"

গোপাল হাসিয়া কহিল, "তুমি ত তোমার বউ কোনমতেই দেখাবে না, বাগবাজারের রসগোল্লা ত আর নয় ভাই, যে আমরা টপ্ ক'রে একেবারে গালে পুরে দেব!

তারাপদ অধীরভাবে কহিল, "অত ভূমিকায় প্রয়োজন নেই—আসল কথা কি বল না।"

গোপাল কহিল, "আসল কথা হচ্ছে, শ্রীমুখপঙ্কজ আজ দেখ্তে পেয়েছি।"

"কি ক'রে ?"

গোপাল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "ভাই তুমি রাগ কর্‌ছ ! যদি অভয় দাও, তা হ'লে বলি ! আজ ভারি এক মজার ঘটনা ঘটেছে।"

তারাপদর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল ; সে কহিল, "কি ?"

গোপাল সহাস্যে কহিতে লাগিল, "আজ দুপুরবেলায় ভোলাদের বৈঠকখানায় ভোলা আর আমি বসেছিলাম—এমন সময় চা'র পাঁচজন মেয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌ল। একটিকে চিন্‌তে পার্‌লাম না, অথচ চেহারাখানা দেখে ভোলাকে না জিজ্ঞাসা ক'রেও থাক্‌তে পার্‌লাম না। ভোলা বল্লে তোমার বউ। ভাল ক'রে দেখ্‌বার জন্যে ভোলা আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল—সেখানে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি, সকলে ব'সে গল্প কর্‌ছে, কেবল তোমার বউই নেই—ফাঁকে চোখ দিয়ে দু'জনে গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে উঠেছি এমন সময় কথা কইতে কইতে কে দু'জন আমাদের ঘরে ঢুক্‌ল। চেয়ে দেখি, ভোলার বোন আর তোমার বউ। ঘর একটু অন্ধকার ছিল ব'লে তারা আমাদের দেখ্‌তে পেলে না, আমরা ত চোরের মত একটা চেয়ারের দু'পাশে দু'জনে টুপ্‌ ক'রে ব'সে পড়্‌লাম। তার পর যে মজার ব্যাপারটা হ'ল—না ভাই, ব'লে কাজ নেই, তুমি হয় ত রেগে যাবে।"

তারাপদর মস্তিষ্ক ক্রোধে ফুটিতেছিল। সে কহিল, "ন্যাকামিতে কাজ কি, ব'লেই যাওনা।"

গোপাল বলিতে লাগিল।—

"তোমার বউ ত এসে টপ্‌ ক'রে সেই চেয়ারটাতে আমাদের দু'জনের মাঝখানে ব'সে পড়্‌ল—আর ভোলার বোন একটা বাক্স খুলে চিঠি বা'র কর্‌তে লাগ্‌ল। দু'জন পনের ষোল বছরের মেয়ে নির্জ্জনে একত্র হ'লে সচরাচর কথাবার্ত্তা কি হয় বুঝ্‌তেই পার্‌ছ। ভোলার বোন তার স্বামীর

একটা চিঠি নিয়ে পড়্তে আরম্ভ ক'রে দিলে, এক লাইন পড়ে আর পাঁচ মিনিট ধ'রে দুই সঙ্গিনীতে টিপ্পনি চলে। ভোলা ত নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে তার ভগ্নিপতির উচ্ছ্বাস আর বোনের রসিকতা শুন্‌তে লাগ্‌ল—আর আমি প্রাণপণ বলে হাসি চেপে তোমার বউকে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। তা ছাড়া আর কি করা যায় বল? এখন, সে সময়ে আমরা দু'জনে যদি আস্তে আস্তে সটান উঠে দাঁড়াই, তা হ'লে কি রকমটা হয় বুঝ্‌তেই পার্‌ছ। তার পর যা হ'ল সে ভয়ানক ব্যাপার—" বলিয়া গোপাল উচ্চস্বরে অবিশ্রান্ত হাসিতে লাগিল।

ক্রোধে তারাপদর সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছিল; একবার তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু গোপালের হাসির তরঙ্গ দেখিয়া মনে হইতেছিল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথাটা এখনও শুনিতে বাকি আছে, তাই সে যাইতেও পারিল না।

সহসা গোপাল গম্ভীর হইয়া কহিল, "তোমার বউএর ও স্বভাবটা ত খারাপ! ও রকম কেন?"

তারাপদর হৃদয়ের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠিল।—"কি রকম?"

"ঘরের ভেতর পানের পিক্ ফেলে কেন?"

তারাপদ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তাতে হয়েছে কি?"

"তবে বলি শোন কি হয়েছে;" বলিয়া গোপাল বলিতে লাগিল,—

"ঘরটা বেশ একটু অন্ধকারমত ছিল, বিশেষতঃ আমি যেখানটা বসেছিলাম সেখানটা ত খুবই। জান ত, সহজে আমি আসল কাজটা ভুলিনে—তাই অমন বিপদের মধ্যে পড়েও মুখটাকে যতদূর সম্ভব খাড়া ক'রে আর চোখ দু'টোকে যথাসম্ভব কপালের ওপর তুলে দিয়ে তোমার বউএর মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ কর্‌ছিলাম, আর বোধ হয় কতকটা তন্ময়ও হ'য়ে পড়েছিলাম—এমন সময় হঠাৎ, বলা নেই, কওয়া নেই, তোমার বউ

এক রাশ পানের পিক্ ঠিক আমার নাকের ওপর ফেলে দিলে! সেই পানের পিক্ আমার নাক বেয়ে, মুখ বেয়ে, গোঁফ্ ভিজিয়ে, জামা পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে দিলে। এখন সে রকম অবস্থায় স্বয়ং সহ্যের অবতারও বোধ হয় ব'সে থাক্‌তে পার্‌তেন না। আমি, 'রামঃ রামঃ' বল্‌তে বল্‌তে সটান উঠে দাঁড়ালাম, ভোলাও কি জানি কেন উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তোমার বউও উঠে পড়্‌ল। বোধ হয় আমাদের চোখের ভেতর সুপুরির কুচি ঢুকে গিয়েছিল, সেই জন্যে তাদের মুখের ভাব কি রকম হয়েছিল দেখ্‌তে পাই নি। কাপড়ে মুখ মুছে যখন তাকালাম—দেখ্‌লাম তারা দু'জনে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার পর বেশ ক'রে সব ধুয়ে ফেলেছি, কিন্তু এই দেখ শার্টে এখনও পানের ফিকে রং দেখা যাচ্ছে; আর গোঁফে এখনও সেন্‌সেন্ না কিসের গন্ধ লেগে রয়েছে। কিন্তু যাই বল তারাপদ, তোমার বউ, ভাই, রূপসী বটে। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কেন তুমি আমাদের ছেড়েছ—আমি হ'লে বোধ হয় চাকরীও ছাড়্‌তাম। এ রকম বউকে চোখের আড়াল ক'রে সুস্থির থাকা যায় না;" বলিয়া গোপাল আবার হাসিতে লাগিল।

গোপালের কাহিনী শুনিয়া তারাপদ ক্রোধে প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম পক্ষ হইলে এ ঘটনা শুনিয়া সে হাসিয়া আকুল হইত, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের চিন্তাস্রোত একটু বিভিন্ন ধারায় বয়। তাই কৌতুকের দিকটা তারাপদকে কিছুমাত্র অধিকার করিতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যখন নিশ্চিন্তমনে আফিসে বসিয়া লেজার বহি পূরণ করে, তখন তাহার স্ত্রী দুইজন পুরুষ মানুষের মধ্যে আসন পাতিয়া প্রণয়কাহিনী প্রকাশ করিবার অবকাশ পায়! বৃথা দরজায় স্প্রীং বসান—বৃথা জানালায় পরদা দেওয়া! মাতালের মত টলিতে টলিতে তারাপদ গৃহে উপস্থিত হইল; তাহার মাথা ঘুরিতেছিল।

কনকলতা তারাপদকে দেখিয়া কহিল, "ও কি, তোমার মুখ অমন কালি হ'য়েছে কেন? অসুখ করে নি ত?"

তারাপদ সে কথার উত্তর না দিয়া কঠোরভাবে কহিল, "গোপালের মুখে যা শুন্‌লাম, সব সত্যি কি না?"

তারাপদর প্রশ্ন শুনিয়াই কনকলতা বুঝিল, তারাপদর মুখ অসুখে বা রৌদ্রে শুষ্ক হয় নাই; দ্বিপ্রহরের ঘটনার কথা সে শুনিয়াছে। অবিচলিতভাবে সে কহিল, "যদি মিথ্যা কোন কথা না ব'লে থাকে, তা হ'লে সব সত্যি।"

কনকলতার সহজ ভঙ্গী দেখিয়া তারাপদ জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, "সে বিষয়ে তুমি কি বল্‌তে চাও?"

তেমনি সহজভাবে কনকলতা কহিল, "বল্‌তে চাই যে, আমার কোন দোষ নেই—আমি কোন অন্যায় কাজ করি নি।"

ক্রোধে তারাপদর কোন কথা মাথায় আসিতেছিল না। হঠাৎ গোপালের কথাটা মনে পড়িয়া গেল; কহিল, "তুমি ভদ্রলোকের ঘরের ভেতর পানের পিক্ কেন ফেল্‌লে, তার কৈফিয়ৎ আমাকে দাও।"

কনক কহিল, "তোমার বন্ধু ভদ্রলোকের স্ত্রীর পাশে নাক উঁচু ক'রে কেন ব'সে থাকে, আগে তার কৈফিয়ৎ নিয়ে এস, তার পর আমার কৈফিয়তের কথা।"

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বচসা করিয়াও তারাপদ যখন স্ত্রীকে পরাভূত করিতে পারিল না, তখন সে সটান বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সমস্ত রাত্রি উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইল না। সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন তারাপদ রবিবারের জন্য অধীরহৃদয়ে অপেক্ষা করিত, কারণ সে দিনটা তাহাকে ভাত মুখে দিয়া লেজার বহি লিখিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে হইত না, সমস্ত দিনটা দ্বিতীয় পক্ষের অঞ্চলবদ্ধ হইয়া নিমেষের মত কাটিয়া

যাইত। কিন্তু শনিবারের ঘটনা এবারের রবিবারকে এমনই ভাবে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল যে, দ্বিপ্রহরে আহার সমাপন করিয়া কনকলতা যখন ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সহসা তারাপদর অভিমান এবং ক্রোধ এমন বাড়িয়া উঠিল যে, সে তাড়াতাড়ি আফিসের কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল।

তারাপদ গমনোদ্যত হইলে কনকলতা ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "দুপুরবেলা এমন সময়ে কোথায় যাচ্ছ?"

"আফিসে" বলিয়া তারাপদ ঘর হইতে বাহির হইয়াই সহসা বাহির হইতে দ্বারের শিকল টানিয়া দিয়া পথে বাহির হইয়া গেল। তারাপদর নিরুদ্ধ ক্রোধ সহসা এইরূপে প্রতিশোধ লইবার পথ করিয়া লইল।

কিছুক্ষণ কনকলতা বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অপমানের আঘাতে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং চক্ষু শুষ্ক হইয়া জ্বলিতেছিল। বন্দী! বন্দী হইয়া তাহাকে থাকিতে হইবে—আপনার গৃহে! পাঁচটার সময় দাসী আসিয়া তাহাকে মুক্ত করিবে—আর এই দীর্ঘ সময়টা সে তাহার ঘৃণিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত জীবন বহন করিয়া অবরুদ্ধ থাকিবে সেই স্বামীর গৃহে—যাহার, তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস, করুণা বা সম্ভ্রম নাই! যদি এতই অবিশ্বাস, তবে আর কেন—একেবারে ছাড়িয়া পলাইবার উপায় করিতে পারিলেই ভাল হয়। অধীরভাবে কনকলতা চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল! বাঃ, সমস্ত ব্যবস্থাই ত ঠিক রহিয়াছে! কড়িকাঠে লোহার আংটা বেশ মজবুত করিয়া আঁটা, তক্তাপোষের উপর বড় টুলটা রাখিলেই অনায়াসে হাত পাওয়া যাইবে—আল্‌নার দড়িটাও যথেষ্ট লম্বা এবং শক্ত আছে। ক্রোধের চেয়েও যে কঠোর এবং অপমানের চেয়েও যে প্রবল, সেই দুর্দ্দমনীয় অভিমান তখন কনকলতার ক্ষুব্ধ হৃদয়কে উত্তেজিত করিতেছিল।

কনকলতা আল্‌নার দড়িটা খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর টুলটা তক্তাপোষের উপর রাখিয়া তাহার উপর আরোহণ করিয়া সেই দড়িটা কড়ির আংটায় শক্ত করিয়া বাঁধিল। তাহার পর শেষ কাজ রহিল, একটা ফাঁস তৈয়ার করিয়া গলায় পড়িয়া টুলটাকে পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া ঝুলিয়া পড়া!

ফাঁসটা সুবিধামত হইতেছিল না বলিয়া কনকলতা ফাঁসটা লইয়া একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল—এমন সময় পিছনের বারাণ্ডা হইতে কে কহিল, "টুলের উপর দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে রে কনক?"

কনক চাহিয়া দেখিল, ললিতা জানালায় দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। হঠাৎ আংটায় বাঁধা দড়ির প্রতি ললিতার দৃষ্টি পড়িল, ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াই ললিতা চীৎকার করিয়া উঠিল—"একি কচ্ছিস্, সর্ব্বনাশি! শীগ্‌গির দোর খোল্!" তাহার পর বাহির হইতে শিকল দেওয়া দেখিয়া ললিতা ত্বরিতবেগে দ্বার খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তখন কনক টুল হইতে নামিয়া তক্তাপোষের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল।

কনকের মুখ তুলিয়া ধরিয়া ললিতা দেখিল, প্রবল অশ্রুধারায় তাহা সিক্ত হইয়া গিয়াছে। উত্তেজনার উষ্ণতায় এতক্ষণ যাহা বাষ্পের মত তপ্ত এবং কঠোর ছিল, একটুখানি স্নেহশীতলতার স্পর্শ পাইয়া তাহা একেবারে বর্ষাধারার মত গাঢ়ভাবে নামিয়াছে! ললিতা সস্নেহে কনকের মুখ বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কি জন্যে ও কাজ কচ্ছিলি—আমাকে খুলে বল্; আমি না এসে পড়্‌লে এতক্ষণ নরককুণ্ডের দোরে পৌঁছুতিস্ যে রে!"

"দিদি—" বলিয়াই কনক উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং স্নেহপরায়ণা ললিতাও কিছু না বুঝিয়াই কনককে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া

কাঁদিতে লাগিল। আকাশেও বোধ হয় এপাশের মেঘকে ঝরিতে দেখিয়া ওপাশের মেঘ এমনি অকারণে ঝরিতে থাকে!

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা নীরব অশ্রুপাতের পর ললিতা বলিল, "এখন বল্ কি হয়েছে—কেন ও কাজ কচ্ছিলি, তারাদা' কোথায়?"

কনক কহিল, "দিদি, তুমি আর পাঁচ মিনিট পরে কেন এলে না, তা হ'লে সব যন্ত্রণার শেষ হ'ত। এ কথা কাউকে বলি নি, বল্‌তামও না—তুমি যখন সব দেখে ফেল্‌লে তখন শোন!" বলিয়া কনক আনুপূর্ব্বিক সকল কথা ললিতাকে জানাইল।

সমস্ত শুনিয়া ললিতা কিছুক্ষণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পর কহিল, "ওরে বোকা মেয়ে, ওরে গাধা মেয়ে, এই জন্যে তুই গলায় দড়ি দিচ্ছিলি, না না, তুই যখন এত বোকা, তোর গলায় দড়ি দেওয়াই উচিত ছিল! স্বামী বেশী ভালবাসে ব'লে, স্ত্রী গলায় দড়ি দেয়, এ আমি কখন শুনি নি!"

কনক করুণভাবে কহিল, "দিদি, তুমি একে ভালবাসা বল?"

"বলিনে ত কি? সন্দেহটা ত একটা ভালবাসার রোগ—যেমন মাথা না থাক্‌লে মাথাধরা অসম্ভব, সেইরকম ভালবাসা না থাক্‌লে সন্দেহও অসম্ভব। ষোল বছরের ধাড়ী হ'লি, একটা সাজোয়ান মদ্দকে নাকে দড়ি দিয়ে খেলাচ্ছিস্, আর এটা বুঝ্‌তে পারিস্ নে!"

কনক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কি জানি, বাস্তবিকই বুঝ্‌তে পারিনে!"

ললিতা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "তারাদাদার পায়ে দড়ি বেঁধে পাড়া চলিয়েছিলি, এখন নিজের গলায় দড়ি দিয়ে দেশ চলা!" বলিয়া ললিতা হাসিতে লাগিল।

কনক কহিল, "আচ্ছা দিদি, আজকের ব্যাপারটা কি রকম বিশ্রী!

তুমি যদি না আস্‌তে, আর গলায় দড়ি যদি আমি না দিতাম, তা হ'লে বিরাজ ঝি এসে ত আমাকে উদ্ধার করত। তার কাছে আমি কি ক'রে মুখ দেখাতাম—আর পাড়ার লোকের কানে যদি এ কথাটা উঠ্‌ত, তা হ'লে তারা কি ভাব্‌ত বল দেখি ?"

ললিতা কহিল, "এ কাজটা তারাদাদার খুব অন্যায় হয়েছে বল্‌তেই হবে। কিন্তু পাড়ার লোকের কথা বলছিস্‌, তুই ম'লে পাড়ার লোক কথা বল্‌ত না ?"

দেওয়ালে তারাপদর একটা ফটো ঝুলিতেছিল, সেটা খুলিয়া আনিয়া ললিতা কহিল, "এই ফটো ছুঁয়ে শপথ কর্‌, আর কখনও অমন মুখ্‌খুর মত কাজ কর্‌তে যাবিনে।"

কনক হাসিয়া কহিল, "আমি ম'লে, দিদি, তোমার দুঃখ হ'ত তাই দিব্যি করাচ্ছ; কিন্তু যাকে ছুঁয়ে দিব্যি করাচ্ছ, আমি ম'লে সে একরকম নিশ্চিন্তই হয়।"

ললিতা কহিল, "আচ্ছা জ্যাঠা মহাশয়, ঢের হয়েছে, চুপ করুন। তুই যদি শপথ করিস্‌ যে, এমন কথা আর কখন মনেও আন্‌বি নে, তা হ'লে আজকেই তোকে দেখিয়ে দিই তারাদাদা তোকে কত ভালবাসেন, আর আজ তুই গলায় দড়ি দিলে তাঁর কি দুর্দ্দশা হ'ত !"

কনক কহিল, "কি ক'রে দেখাবে আগে বল, তার পর দিব্যি কর্‌ব।"

ললিতা তাহার কৌশলের কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিল। শুনিয়া কনক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কহিল, "দিদি, এক্ষণি আরম্ভ ক'রে দাও, হঠাৎ যদি এসে পড়ে তা হ'লে সব মাটী হবে !"

ললিতা ফটোগ্রাফটা আগাইয়া দিয়া কহিল, "নে, আগে ছুঁয়ে দিব্যি কর্‌।"

কনক হাসিয়া কহিল, "দিব্যি কর্‌ছি, এবার গলায় দড়ি দেবার সময় আগে তোমার পথ ভাল ক'রে বন্ধ কর্‌ব।"

ললিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার ভাব দেখিয়া এবং তারাপদকে জব্দ করিবার ফন্দি পাছে নষ্ট হয়, সেই ভয়ে কনক যথাদেশ অঙ্গীকার করিল।

তখন ললিতা একটা বড় পাশ-বালিস লইয়া তাহার একপ্রান্তে কঠিনভাবে একটা দড়ি বাঁধিল—অর্থাৎ ক্ষুদ্র দিকটা হইল কনকের মাথা ও বৃহৎ দিকটা হইল তাহার দেহ!

কনক কহিল, "দিদি, একটা ভাল সাড়ী বা'র কর্‌বো? অনেকে ত সেজেগুজে মরে!"

ললিতা কহিল, "আর সাজ্‌তে হবে না, যা যা পরে আছিস, সব খুলে দে।"

কনক বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিল। পাশ-বালিসের মাথার দিকটায় খানিকটা কাপড়ের টুকরা বাঁধিয়া ললিতা কবরী রচনা করিল।

তাহার পর পাশ-বালিসটাকে কনকের সেমিজ জ্যাকেট পরাইয়া দিল। জ্যাকেটের হাতার ভিতর এবং বক্ষ ও পৃষ্ঠের ভিতর বস্ত্র ভরিয়া গঠন প্রদান করিল। অবশেষে কনক যে নীলাম্বরী সাটীখানি পরিয়াছিল সেটি নকল কনকের অঙ্গে ভাল করিয়া পরাইয়া দিল, মাথার উপর দিয়া সাড়ীর বেড়টি এমন করিয়া ঘুরাইয়া দিল যে, পশ্চাৎ দিক্ হইতে ছলনা বুঝিবার আর কোনও উপায় রহিল না। তাহার পর কনকের বাঁধা দড়িতে একটা ফাঁস দিয়া সেই ফাঁসে পাশ-বালিসের গলা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিল। টুলটিকে এমন ভাবে ফেলিয়া রাখিল যাহাতে দেখিলেই মনে হয় যে, গলায় ফাঁস লাগাইয়া সেটাকে পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সমস্ত যখন প্রস্তুত হইয়া গেল, তখন ঘরের অন্য একটি দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া এবং যে দ্বার তারাপদ বাহির হইতে শিকল দিয়া গিয়াছিল, সেই দ্বারটি ভিতর হইতে হুড়্‌কা দিয়া কনক এবং ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তৎপরে নবোন্মুক্ত দ্বারটি বন্ধ করিয়া, অর্গল দেওয়া দ্বারটি বাহির হইতে পূর্ব্ববৎ শিকল দিয়া দিল। উন্মুক্ত জানালা দিয়া অর্দ্ধতমসাবৃত ঘরের মধ্যে সেই বিভীষিকাজনক দৃশ্য দেখিয়া কনক এবং ললিতা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

ললিতা কনকের দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখ্‌ছিস্ পোড়ারমুখি, আমি না এলে তোর কি দুর্দ্দশা এতক্ষণ হ'ত!"

কনকলতা ভীতিবিস্ময়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না!

বেলা চা'রটার সময় যখন বিরাজ ঝি উপস্থিত হইল, কনক তাহাকে কহিল, "ঝি, তোমার বোনপোর অসুখ হয়েছিল বল্‌ছিলে না, আজ তুমি তাকে দেখ্‌তে যেতে পার। কিন্তু কাল খুব সকাল ক'রে এসো।"

এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ লাভে ঝি অতিশয় বিস্মিত হইল। যদিও বোনপোর আরোগ্য সংবাদ সে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছিল, কিন্তু সে কথা সে প্রকাশ করিল না; কহিল, "রান্নার জলটা তুলে দিয়ে যাই মা?"

কনক কহিল, "না না, আজ রান্না হবে না, দিদির বাড়ী নেমন্তন্ন। তুমি এখনই যাও।"

ঝি উভয়ের মুখ একটু সন্দিগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিয়া আর কোন কথা না বলিয়া প্রস্থান করিল।

৫

দ্বারে শিকল চড়াইয়া দিয়া তারাপদর রাগটা যেন হঠাৎ আরও কিছু বাড়িয়া গেল। সেই রাগের ভরে দ্রুতপদে ষ্টেশনে আসিয়া সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। কিন্তু ট্রেন যখন গৃহপল্লী মাঠ-ঘাট পশ্চাতে ফেলিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তখন তারাপদর মন যেন ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, কাজটা তেমন ভাল হয় নাই, একটু মাত্রাতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে।

হাওড়ার পুলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে তারাপদর মন আরও অবসন্ন হইয়া আসিল, অনুশোচনার মতই যে একটা কিছু তাহার মনের মধ্যে পথ করিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহাতে ভুল ছিল না। জোয়ারের জলে পুলটা ধনুকের মত বাঁকিয়া উঠিয়াছিল, একটা মালবোঝাই গরুর গাড়ীর পিছন দিকে দুইজন লোক সজোরে ধরিয়াছিল, তথাপি ঢালুর উপর দিয়া সবেগে সেটা নামিয়া আসিতেছিল; হঠাৎ গাড়ীটা বাঁকিয়া গিয়া তারাপদর উদরে বলদের শিং ফুটিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণের জন্য তারাপদ এক লাফ দিতেই একব্যক্তির নাসিকার উপর তাহার মাথাটি গিয়া পড়িল। সে তারাপদর কৈফিয়তের প্রতি কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। তারাপদর অন্তঃকরণ বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে কোনপ্রকারে আফিসে পৌঁছিয়া তারাপদ যখন লেজার বহি খুলিয়া লিখিতে বসিল, তখন তাহার বাস্তবিকই কান্না আসিতেছিল। কেন সে হঠাৎ এমনটা করিয়া বসিল! কেন তাহার মাথার মধ্যে এ দুর্বুদ্ধি আসিয়া জুটিয়াছিল! কিন্তু দণ্ডও ভগবান্ হাতে হাতে দিয়াছেন। "দীর্ঘ ছয় দিনের কামনার বস্তু, পরিশ্রমের পুরস্কার রবিবার ছুটির দিনে

আফিসে আসিয়া লেজার বহি লেখার মত শাস্তি আর তাহার পক্ষে কি আছে! গরুর শিংএ পেট চিরিয়া গেলেই ভাল হইত।

পাঁচ মিনিট লেখার পর তারাপদ হঠাৎ দেখিল, লেজার বহিতে যাহা কিছু লিখিয়াছে, সমস্তই ভুল স্থানে লিখিয়াছে, ক্রোধভরে কলমটা সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তারাপদ মুখ বক্র করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ তাহাব একটা কথা মনে হইল। কনকলতা অভিমানভরে যদি কিছু করিয়া বসে! যদি আলমারী হইতে মালিসের ঔষধটা লইয়া পান করে! কিম্বা যদি—! কিছুমাত্র অসম্ভব নয়! উঃ এ কথাটা তাহার এতক্ষণ মনে হয় নাই!

ঘড়িতে চাহিয়া দেখিল সাড়ে চা'রটা। এখনি বাহির হইলে চা'রটা পঞ্চাশেব এক্সপ্রেস্ ধরা যায়। তাড়াতাড়ি বহিপত্র বন্ধ করিয়া ছাতা ও চাদব বগলে পুরিয়া তারাপদ আফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িল। দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে যখন হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, ঠিক তখন চা'রটা পঞ্চাশের এক্সপ্রেস্ ধীর মন্থরগতিতে প্ল্যাট্‌ফরম্ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। গতিশীল গাড়ীতে উঠিবার জন্য তারাপদ সবেগে দৌড় দিল, কিন্তু সহসা কোথা হইতে একজন দুর্ব্বৃত্ত টিকিট কলেক্টার দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের একবার বিফল চেষ্টা করিয়া তারাপদ নিরুপায় হইয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বর্দ্ধমান লোকাল।

সুদীর্ঘ অর্দ্ধ ঘণ্টার অবসানে বর্দ্ধমান লোকাল অবশেষে ছাড়িল। শ্রীরামপুরে গাড়ী সম্পূর্ণভাবে থামিবার পূর্ব্বেই তারাপদ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ছুটিল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সে যখন গৃহের দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যার সমাগমে চতুর্দ্দিক

অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল। দরজা ঠেলিয়া গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া তারাপদ কাহারও সাড়া পাইল না, সমস্ত গৃহ একটা জমাট নিস্তব্ধতা বক্ষে ধরিয়া গম্ভীর হইয়াছিল। তারাপদর অন্তরের নিভৃত প্রদেশ একটা ভীষণ অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

"বিরাজ, বিরাজ!"

কেহ উত্তর দিল না। মৌন গৃহ তারাপদর উচ্চ কণ্ঠ শুনিয়া আরও স্তব্ধ হইয়া গেল। ত্বরিতপদে বারাণ্ডায় উঠিয়া তারাপদ দেখিল দ্বারে তেমনই ভাবে শিকল লাগান রহিয়াছে। অধীরভাবে দ্বারে করাঘাত করিয়া তারাপদ ডাকিল—"কনক, কনক!" ভিতরে কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। ঘরের জানালা অল্প খোলা ছিল, সেটাকে হাত দিয়া খুলিয়া তারাপদ ঘরের ভিতর চাহিয়া দেখিল। মুহূর্ত্তমাত্র নির্ব্বাক থাকিয়া একটা গভীর শব্দ করিয়া তারাপদ ভূতলে পড়িয়া গেল। অন্তরাল হইতে যে দুইটি প্রাণী এতক্ষণ অমিশ্র পুলকের সহিত কৌতুক দেখিতেছিল, তাহারা যখন তারাপদর নিকট ছুটিয়া আসিল তখন তারাপদর সম্পূর্ণভাবে চৈতন্য লুপ্ত হইয়াছিল।

কনক অধীরভাবে কহিল, "দিদি, শীগ্‌গির ডাক্তার ডাকাও!"

ললিতা কহিল, "ডাক্তার আন্‌লে জানাজানি হবে, কোন ভয় নেই, তুই শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে আয়।"

শুশ্রূষার পর যখন তারাপদর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন সেখানে কেবলমাত্র ললিতা উপস্থিত ছিল। ললিতাকে দেখিয়া তারাপদ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—

"আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে ললিতা!"

ললিতা স্থিরভাবে কহিল, "সর্ব্বনাশ হচ্ছিল, হয় নি।"

তারাপদ ত্বরিতবেগে উঠিয়া বসিয়া কহিল, "কি বল্‌ছ? সর্ব্বনাশ হয় নি! কনক বেঁচে আছে?"

ললিতা কহিল, "আছে, কিন্তু থাক্‌ত না যদি আর এক মিনিট দেরীতে আমি এ বাড়ীতে পা দিতাম। ছিঃ দাদা, তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়েছে? মিছে মনের মধ্যে কতকগুলা পাপ পুষে নিজে কষ্ট পাচ্ছ, অন্যকেও কষ্ট দিচ্ছ। দেখ দেখি, তুমি ত আজ এই কাণ্ডটি প্রায় ঘটিয়েছিলে;" বলিয়া হাত দিয়া ঠেলিয়া ললিতা জানালা খুলিয়া দিল।

তখনও নকল কনক গলায় দড়ি বাঁধিয়া তেমনি ঝুলিতেছিল। তারাপদ দেখিয়া পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

ললিতা কহিল, "ভয় পেয়োনা, ও কনক নয়, কনক পাশের ঘরে ব'সে আছে। দুপুরবেলা হঠাৎ এসে পড়ে আমি যে ঘটনাটা কোন রকমে আট্‌কাতে পেরেছিলাম, সেইটে তোমাকে দেখাবার জন্যে সাজিয়ে রেখেছি। কিন্তু এক মিনিট দেরীতে আমি যদি আস্‌তাম, তা হ'লে আসল কনক এতক্ষণ ঐখানে ঝুল্‌ত!"

বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া তারাপদ কহিল "তবে ও কে?

ললিতা মৃদুহাস্য করিয়া কহিল, "ও মানুষ নয়, পাশ-বালিস;" বলিয়া পাশের ঘর হইতে কনককে টানিয়া বারাণ্ডায় আনিল এবং বিস্তারিত-ভাবে সকল ঘটনা বিবৃত করিল।

কনক নীরবে কাঁদিতেছিল।

তারাপদ ললিতার নিকট আসিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ললিতা, তুমি আজ কনকের প্রাণ দিয়েছ—আর আমাকে জ্ঞান দিয়েছ, তোমাকে কি বল্‌ব আমি ভেবে পাচ্ছি নে!"

ললিতা অপ্রতিভ মুখে কহিল, "আমাকে কিছু বল্‌তে হবে না।

তোমরা দু'জনে একটু পরে আমাদের বাড়ী এস, আজ রাত্রে তোমরা সেখানে খাবে। আমি চল্লাম, উয্যুগ করিগে; কনক, বেশী দেরী করিস্ নে, আধ ঘণ্টার মধ্যে আসিস্;" বলিয়া ললিতা প্রস্থান করিল।

ইহার পর কনক ও তারাপদর মধ্যে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, গল্পলেখকের তাহা ঠিক বিদিত নাই—তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ললিতার অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই—অর্থাৎ আধ ঘণ্টা নহে, প্রায় দুই ঘণ্টা অধীর অপেক্ষার পর অগত্যা ললিতা যখন দু'জনকে ডাকিবার জন্য তারাপদর গৃহে উপস্থিত হইল—তখনও তারাপদ আফিসের সজ্জা পরিত্যাগ করে নাই এবং কনকের রক্তিম মুখের উপর একটি সলজ্জ লঘু হাস্য মুহুর্মুহুঃ অকারণে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সমাপ্ত